অর্হম্ ।

অহিংসা-দিগ্‌দর্শন ।

শাস্ত্রবিশারদ-জৈনাচার্য্য শ্রীবিজয়ধর্ম্মসূরি
বিরচিত ।

(হিন্দি হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত ।)

প্রথম সংস্করণ ।

राय लक्ष्मीपतिसिंहजी बहादुर के सुपुत्र बाबू छत्र-
पतिसिंहजी के सुपुत्र श्रीपतिसिंहजी और
जगत्पतिसिंहजी की सहायता से

কাশীস্থ যশোবিজয় জৈন পাঠশালার ম্যানেজার
শ্রেষ্ঠী হরকচাঁদ ভুরাভাই দ্বারা প্রকাশিত ।

৺কাশীধাম মহালক্ষ্মী যন্ত্রে,
শ্রীঅক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত ।
বীরসম্বৎ ২৪৩৭ ।

ধর্ম্মাব্দ ২, বেনারস সিটী ।　　　　মূল্য ।০ চারি আনা ।

প্রস্তাবনা।

(গ্রন্থকারের মন্তব্য)

(হিন্দি হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত।)

যদিও এই গ্রন্থের নাম পাঠ করিলেই প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য অধিগম্য হয়, আর অতিরিক্ত প্রস্তাবনার প্রয়োজন হয় না, তথাপি এরূপ নিয়ম আছে যে "কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না" তজ্জন্য এই গ্রন্থ রচনা বিষয়ে কোনরূপ কারণ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন; সেই কারণ কি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আমি এই প্রস্তাবনা লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, যদি সে বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলি, তবে সেই গুলিকে আমি অসম্পূর্ণ অথবা অস্থানে পতিত মনে করিব না।

বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান সময়ে বহুবিধ প্রাচীন, আধুনিক, মূল, ভাষান্তর, প্রবন্ধ, নাটক, নভেল, ভজন ও কীর্ত্তনাদির গ্রন্থ যে প্রণালীতে রচনা হইতেছে, এই "অহিংসা-দিগ্‌দর্শন" নামক পুস্তকও সেই প্রণালীতে রচিত হইল। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য লিখিতে হইলে আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ", "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" ইত্যাদি মহর্ষিগণের অমৃতময় বাক্যের উল্লেখ ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকা সত্ত্বেও, হিন্দুনামধারী কতশত ভারত সন্তান জানিয়া, শুনিয়া মাংসাহার হইতে নিবৃত্ত থাকে না। যে সকল লোক ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন না জানিয়া কেবল রসনার তৃপ্তিসাধনের জন্য মাংসাহার করে, তাহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইলে মাংসাহার পরিত্যাগ করিবে, এই আশয়ে করুণাভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমি শাস্ত্র, অনুভব এবং লৌকিক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সহ এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।

যাহাতে পাঠকগণের অন্তঃকরণে কোনরূপ রাগদ্বেষাদি ভাবের উপলব্ধি না হয়, তদ্বিষয়ে যতদূর সম্ভব সাবধানতার সহিত এই নিবন্ধ লিখিত হইল, এবং শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাতে অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ না করে, তজ্জন্য লৌকিক দৃষ্টান্ত এবং যুক্তির দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা গেল। প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিতে হইল যে, গুজরাট দেশ ছাড়িয়া যখন আমি মধ্যদেশ

বাঙ্গালা, মগধ এবং মিথিলা প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করি, সেই সময়ে ঐ সকল দেশে ঘোর হিংসাবৃত্তির অনুষ্ঠান দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে ২ ভাবের উদয় হইয়াছিল, কেবল তাহার সামান্য দিগ্‌দর্শন এস্থলে নির্ণীত হইলে আর একখানি এইরূপ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়, কিন্তু সে বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কেবল যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্মের মাতাস্বরূপা "অহিংসা" দেবীর বিদ্বেষকারী, যাহারা ধর্ম্মের উদ্দেশে প্রাণিহিংসা করে, দেবীর সম্মুখে যাহারা দেবীর পুত্রগণকে হত্যা করে, সেই সকল ক্রূরাত্মা মনুষ্যগণের হৃদয়ে দয়াভাব উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে "যাবদ্‌ বুদ্ধিবলোদয়ম্‌" এই নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক "অহিংসা-দিগ্‌দর্শন" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আমি সহৃদয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

কেবল জৈনশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া যে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু অধিকাংশ স্থলে পুরাণ, মহাভারত, মনুস্মৃতি, গীতা প্রভৃতি হিন্দু-দিগের মাননীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহাতে অহিংসা ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে। পরিশেষে আমার এই করুণাভাব এই বিস্তীর্ণ জগতের সকল প্রদেশে নিবাস করিবে এইরূপ আশা করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবনা সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম।

লেখক—

শ্রীবিজয় ধর্ম্ম সূরি জৈনাচার্য্য

॥ अर्हम् ॥

शास्त्रविशारद-जैनाचार्य-श्रीविजयधर्मसूरि ।

D. A. PRESS, BENARES CITY.
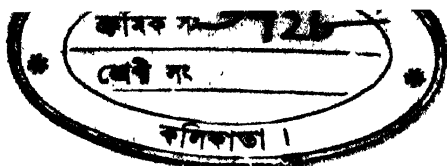
শাস্ত্রবিশারদ জৈনাচার্য্য শ্রীবিজয়ধর্ম্মসূরি মহারাজের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

কাশীস্থ জৈন-যশোবিজয় পাঠশালা হইতে প্রকাশিত অনেক গুলি পুস্তকের সমালোচনা মাসিক পত্র " সরস্বতী " তে পূর্ব্বে নির্গত হইয়াছে, পাঠকগণ উহা পাঠ করিয়া অবশ্যই জৈন পাঠশালার বিষয় পরিচিত আছেন। এক্ষণে উক্ত পাঠশালার অধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীবিজয়ধর্ম্ম সূরির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠকগণের গোচর করিতেছি। আচার্য্য মহাশয় এরূপ মহাত্মা যে ভারতের অনেক প্রতিষ্ঠাবান বিদ্বান ব্যক্তি ইহাঁর আদর করেন এবং ইহাঁর প্রতি বড়ই শ্রদ্ধাবান্। ইহাঁর চরিত্রের বিষয় কিছুদিন হইল " বাণী " নামক বাঙ্গালা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রকাশিত বিষয় অবলম্বনে নিম্নের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

কাটিয়াবাড় নগরে মহুবা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় বীশা-শ্রীমালী জাতীয় বৈশ্যবংশে সম্বৎ ১৯২৪ সালে জৈনগুরু শ্রীবিজয়ধর্ম্মের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম সেঠ রামচন্দ্র এবং মাতার নাম কমলা দেবী। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে ইহাঁর নাম মূলচন্দ ছিল। ৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন, পরন্তু তথায় ইনি কিছুই শিখিতে পারেন নাই। যখন ইহাঁর পিতা দেখিলেন যে পাঠে ইনি মনোযোগ করিতেছেন না, তখন তিনি ইহাঁকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে ইহাঁর হৃদয়ক্ষেত্রে বিদ্যার অভিরুচি অঙ্কুরিত হইল। তখন সাংসারিক কার্য্যে অবসর পাইলে ইনি পরিশ্রমের সহিত গুজরাট্ ভাষা শিখিতে লাগিলেন। অল্পবয়সেই ইনি পিতা কর্তৃক আপন ব্যবসায়ে নিপুণ হইলেন, কিন্তু ১৫ বৎসর বয়সে সঙ্গদোষে ইনি সট্টা এবং জুয়া খেলায় বড়ই আশক্ত হইয়া পড়িলেন। ২০ বৎসরের সময় ইহাঁর স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্তন হইল; তখন ইনি চিন্তা করিলেন যে তুচ্ছ সাংসারিক সুখের জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছি, ইহার শতাংশ সময় যদ্যপি আধ্যা-

ত্মিক উন্নতির বিষয়ে ন্যস্ত করি, তবে বিশেষ উপকার পাইব। এইরূপ চিন্তায় ইহাঁর মন হইতে সাংসারিক মায়াজাল অপসৃত হইল। তখন ইনি গৃহত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; সৌভাগ্যক্রমে ইনি শীঘ্র এক সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইলেন, এবং নিজের সদ্‌গুণের কারণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই গুরুর কৃপাপাত্র হইলেন। গুরু ইহাঁকে জৈনসাধু হইবার জন্য মাতা পিতার আজ্ঞা লইতে গৃহে পাঠাইলেন, মাতা বাৎসল্য হেতু পুত্রের সাধু হইবার ইচ্ছার প্রতি বিরোধী হইলেন, কিন্তু ইহাঁর দূরদর্শী পিতা দেখিলেন যে পুত্রের চিত্ত সংসার হইতে একেবারে বিরক্ত হইয়াছে, সুতরাং আমি ইহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিলে, এ থাকিবে না, তজ্জন্য তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক ইহাঁকে সাধু হইবার আজ্ঞা দিলেন। তখন মূলচন্দের দীক্ষাগ্রহণ করিবার মার্গে আর কোনরূপ অবরোধ থাকিল না, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপঞ্চমী সম্বৎ ১৯৪৩ সালে ভাওনগরের বিখ্যাত মহাত্মা শান্তমূর্ত্তি শ্রীবৃদ্ধিচন্দ্র মহারাজের নিকট ইনি দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। সেই অবধি মূলচন্দের নাম "ধর্ম্মবিজয়" হইল।

জৈনধর্ম্মের মতে আত্মোন্নতি এবং জগতের উপকার সাধন করা সাধুগণের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনসাধুগণ ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়া সংসারের উপকার সাধন করেন। ধর্ম্মজ্ঞানের নিমিত্ত বিশেষরূপে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন; সম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা অসম্ভব, এই ভাবিয়া মহাত্মা ধর্ম্মবিজয় দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় রত থাকিয়া গুরুর নিকট ধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরুসেবায় ইহাঁর অতিশয় আশক্তি ছিল, সুতরাং ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য ইহাঁর ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় নাই। কেবল প্রতিক্রমণ* অর্থাৎ পঞ্চসন্ধ্যা শিক্ষা করিতেই ইহাঁর দেড় বৎসর লাগিয়াছিল, সহপাঠী এবং অন্যান্য সাধুগণ তজ্জন্য ইহাঁকে বিদ্রূপ করিতেন, পরন্তু ইনি হতোৎসাহ না হইয়া ধীরে ধীরে আপন কার্য্যসাধনে তৎপর ছিলেন।

গুরুভক্তি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া ইহাঁর গুরু অন্তিমসময়ে ইহাঁকে "পংন্যাস" উপাধি দিবার জন্য আপনার শিষ্যগণকে আদেশ করেন। সম্বৎ

---

* জৈনগণ সন্ধ্যাবন্দনাকে "প্রতিক্রমণ" বলেন। স্বকৃত পাপাদি নিবারণার্থে জৈনেরা পাঁচ প্রকার প্রতিক্রমণ করেন—প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, পাক্ষিক সন্ধ্যা, চাতুর্ম্মাসিক সন্ধ্যা এবং বার্ষিক সন্ধ্যা।

১৯৪৯ বৈশাখ শুক্লসপ্তমীতে ইহাঁর গুরুদেবের শরীর পতন হয়, তখন ইনি ভাওনগর পরিত্যাগ করিলেন। সম্বৎ ১৯৪৯ সালে চাতুর্মাস্য ইনি লোমড়ী নগরে অতিবাহিত করেন। এইরূপে গুজরাটের অনেক নগর ঘুরিয়া ফিরিয়া ইনি লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। এই প্রকার কার্য্যে ইহাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাঁর ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া কেবল জৈনদিগের নহে, পরন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়েরও অনেক উপকার হইয়াছে। এই সময় ইহাঁর বিদ্যানুরাগও বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল। বাল্যকালে নিয়মিতরূপে সঞ্চালিত না হওয়াতে ইহাঁর মেধাশক্তি অবসন্ন হইয়াছিল, তথাপি অতিশয় পরিশ্রম সহকারে ইনি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিলেন এবং ধর্ম্ম এবং দর্শনশাস্ত্রেও উত্তম জ্ঞানলাভ করিলেন।

লুপ্তপ্রায় জৈনগৌরব পুনরুদ্ধার করা ইহাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইনি অনেকগুলি কার্য্য করিয়াছেন। ১৯৫২ সম্বতে ইনি সাদ্‌ড়ীস্থিত জৈনসম্প্রদায়ের নানাপ্রকার বিবাদ মিটাইয়া দিয়া অনেক কষ্টে রাণকপুর জৈন-শ্বেতাম্বর মন্দিরের ব্যবস্থা করেন; ১৯৫৩ সম্বতে উপরিয়ালা তীর্থের উদ্ধার করাইলেন। ঐ তীর্থ ভোজনী গ্রাম হইতে ১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, ঐস্থানে ফাল্গুন্ শুক্লাষ্টমী তিথিতে অতি সমারোহের সহিত এক মেলা হয়।

সম্বৎ ১৯৫৭ শ্রাবণীপূর্ণিমার দিন ইনি বীরমগ্রামের জৈনদের উৎসাহিত করিয়া এক বৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপিত করাইয়াছেন। সেই পুস্তকালয়ের নাম "ধর্ম্মবিজয় পুস্তকালয়" হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর দ্বারা সৌরাষ্ট্র, গুজরাট্ মালব, কাটিয়াবাড় প্রভৃতি দেশে অনেক লুপ্তপ্রায় এবং সম্পূর্ণ লুপ্ত জৈনতীর্থের উদ্ধার ও অনেক স্থানে সংস্কৃত পাঠশালা এবং জ্ঞানাগার স্থাপিত হইয়াছে।

প্রাচীন সময়ে জৈনদিগের সংস্কৃত এবং প্রাকৃত সাহিত্য আলোচনার যে সকল স্থান ছিল, ইনি সেগুলির পুনঃস্থাপনের ইচ্ছা করিলেন; সেজন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইনি স্থির করিলেন যে কাশীতে এক জৈনপাঠশালা স্থাপিত করিয়া জৈনছাত্রগণকে যদ্যপি সংস্কৃতশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সফল হইবে; তজ্জন্য ইনি যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইনি সকলকে আপনার মন্তব্য জানাইলেন, অনেকে ইহাঁর পরমোপযোগী সংকল্প শুনিয়া সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। বীরমগ্রামে এক কার্য্যকারিণী

সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল, তথায় পাঠশালার কার্য্যের নিমিত্ত টাকা জমা হইতে থাকিল। কিছু অর্থ সংগ্রহ হইলে ধর্ম্মবিজয় মহাশয় কতকগুলি বিদ্যার্থী এবং জৈনসাধু সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন; জৈনসম্প্রদায়ের সাধুগণ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে কোনরূপ যান ব্যবহার করেন না, সেজন্য তাঁহারা সকলে পদব্রজে চলিলেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়া তাঁহারা চতুর্থ মাসে কাশীধামে পৌঁছিলেন।

ইহাঁরা সকলে সম্বৎ ১৯৫৯ বৈশাখ শুক্লতৃতীয়ার দিবস কাশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে কাশীতে জৈনসাধুদিগের আগমন বড় অধিক ছিলনা; সে কারণ জৈন গৃহস্থগণ সাধুগণের উপযুক্ত সৎকার করিতে জানিত না। কাশীতে জৈনযতি* অনেক থাকিতেন বলিয়া গৃহস্থগণ জৈন অতিথিদিগের আচার ব্যবহার জানিত, কিন্তু তাহারা যতি এবং সাধুদিগের প্রভেদ অবগত ছিল না; সেজন্য মুণিমহারাজ এবং তাঁহার কয়েকজন সাধুশিষ্যের আচার ব্যবহার দেখিয়া গৃহস্থগণ নূতন বলিয়া মনে করিল। যাহা হউক বিজয়ধর্ম্ম এবং তাঁহার সঙ্গী কয়েকজন জৈনসাধু কাশীতে জৈন গৃহস্থদের উপদেশ দিয়া সাধুজীবনের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়া দিলেন; তাহার ফলে তথাকার জৈনদের শ্রদ্ধাভক্তি ইহাঁদের উপর দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময় মুণিমহারাজ এক প্রাচীন ধর্ম্মশালায় জৈনপাঠশালার কার্য্য আরম্ভ করিলেন; এই পাঠশালার নাম "শ্রীযশোবিজয় জৈনপাঠশালা" রাখা হইল। তাহার পর মুণিমহারাজ শ্রীধর্ম্মবিজয়জী পাঠশালার জন্য একটী উত্তম গৃহ স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন যে নন্দন-সাহু মহল্লায় "ইংরাজীকুঠী" নামক ইমারতগৃহ পাঠশালার উপযুক্ত হইবে। মুণিমহারাজের উপদেশানুসারে তাঁহার গৃহস্থশিষ্য বম্বাই নিবাসী সেঠ বীরচন্দ দীপচন্দ, সীঃ আইঃ ইঃ, জে, পী, এবং সেঠ গোকুলভাই মূলচন্দ ইহাঁরা ২৫ পঁচিশ সহস্র টাকায় উক্ত গৃহ পাঠশালার জন্য ক্রয় করিয়া দিলেন। সেই বাটীতে পাঠশালার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে, শ্রীধর্ম্মবিজয়জী চেষ্টা করিয়া তথায়

---

* জৈনেরা "যতি" তাঁহাকে বলে যিনি দ্রব্য ও ধাতু স্পর্শ করেন, একস্থান হইতে স্থানান্তর যাইতে হইলে যানাদির ব্যবহার করেন, এবং নাপিতের দ্বারা ক্ষৌর কার্য্য নিষ্পাদন করেন। "সাধু" তাহাদের বলে যাঁহারা ঐ সকল কার্য্য করেন না। জৈনযতি শুক্লবস্ত্র পরিধান করেন এবং সাধু পীতবস্ত্র পরিধান করেন।

একটী সংস্কৃত পুস্তকালয় স্থাপিত করিলেন, যাহার নাম "হেমচন্দ্রাচার্য্য বিদ্যা ভাণ্ডার" রাখা হইল।

সম্বৎ ১৯৬২ সালে প্রয়োগে কুম্ভমেলা হয়; সে সময় পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় মহাশয়ের উদ্যোগে তথায় "সনাতন-ধর্ম্ম-মহাসভা" নামে এক সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভার ভারতবর্ষেয় সকল স্থান হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়াছিলেন, শ্রীধর্ম্মবিজয় মহারাজ নিমন্ত্রিত হইয়া পাঠশালার ছাত্রগণ ও সাধুগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাঘ শুক্ল প্রতিপদের দিন ধর্ম্মবিজয় মহারাজ তথায় "জ্ঞানগোষ্ঠীর ঐক্য" বিষয় একটী উৎকৃষ্ট জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন; সেই সভার অধিবেশনে উৎকল খণ্ডের শঙ্করাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুণিমহারাজ কাশী আসিলেন এবং পাঠালার উন্নতি কার্য্যে যত্নবান হইলেন। পুনরায় সম্বৎ ১৯৬৩ কার্ত্তিক শুক্ল প্রতি পদের দিন শ্রীধর্ম্মবিজয় মহারাজ শ্রীপার্শ্বনাথ তীর্থ (সম্বেতশিখর) যাত্রা করিলেন, এই সময় তাঁহার সমভিব্যাহারে অনেকগুলি সাধুশিষ্য এবং বিদ্যার্থী ছিল। পার্শ্বনাথ যাত্রা সমাপ্ত করিয়া ২০ জন বিদ্যার্থী এবং ৫ জন সাধু সঙ্গে লইয়া ইনি বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিছুদিনের পর কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় জৈনধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। জৈনদের তো কথাই নাই, পরন্তু অন্যান্য লোকেও অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সেই ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিল। অনেকানেক বাঙ্গালী যুবকের ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া ইনি রায় বদ্রীদাস বাহাদুরের বাটিতে গিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। এই সময় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সহিত মুণিমহারাজের পরিচয় হইল। পণ্ডিত মহাশয় মুণিমহারাজের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তিনি ইহাঁর নিকট জৈনদর্শন পাঠ করিলেন এবং মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিলেন।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" সমিতির সভ্যগণের অনুরোধে শ্রীধর্ম্মবিজয় মহারাজ দুইবার অধিবেশনে সভাপতির আসনগ্রহণ করেন; দুইবারেই ইনি অতি সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন; অনেক বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া ইহাঁর মত গ্রহণ করিয়াছেন।

জৈনপাঠশালায় সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীধর্ম্মবিজয় মহারাজ কলিকাতা হইতে বঙ্গদেশের প্রধান বিদ্যাপীত নবদ্বীপে যাত্রা

করেন, এবং অনেক বিচার করিয়া তথাকার শিক্ষাপ্রণালী নিরীক্ষণ করেন। নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ইহাঁর বড়ই আদর করিয়াছিলেন। তথা হইতে ইনি কাশীতে ফিরিয়া আসেন; কাশী আসিয়া পাঠশালার বড় দুরবস্থা দেখিলেন, তখন ছাত্রসংখ্যা ৫৩ হইতে একেবারে ৮ জন হইয়াছিল, দেখিয়া ইনি পুনরায় উহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে পাঠশালার দিন দিন উন্নতি হইতেছে।

শ্রীবিজয়ধর্ম্ম মহারাজ কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, সম্বৎ ১৯৬৪ শ্রাবণ শুক্লচতুর্দ্দশীর দিবস শ্রীযশোবিজয় জৈন পাঠশাঠায় একটী সুমহৎ সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় কাশীনরেশ মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, জি, সি, এস্ আই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন এবং সকলে একমত হইয়া শ্রীধর্ম্মবিজয় সূরি মহারাজকে "শাস্ত্রবিশারদ জৈনাচার্য্য" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা পত্রে দস্তখৎ করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে জৈনপাঠশালায় অনেক সুবিজ্ঞ অধ্যাপক আছেন; তাঁহাদের দ্বারা বিদ্যার্থীগণ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-ভাষায় উত্তম শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। মুণিমহারাজের সুযোগ্য শিষ্য ইন্দ্রবিজয় পাঠশালার জন্য অতিসুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন, পরন্তু তাহাতে শ্রীধর্ম্মবিজয় মহারাজের বিশেষ সন্তোষ জন্মে না, তাহার কারণ মুণিমহারাজ মনে করেন যে পালীভাষা না জানিলে ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এবং ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণরূপে হওয়া সুকঠিন। তজ্জন্য গত বৎসর যখন মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, ভারতগভর্ণমেণ্টের আদেশে সিংহলদ্বীপে (Ceylon) গমন করেন, সেই সময় পণ্ডিত-মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পালীভাষা শিখিবার অভিপ্রায়ে মুণিমহারাজ দুইজন গৃহস্থ শিষ্যকে তথায় পাঠাইয়া দেন। সেই দুইজন শিষ্য তথায় পালীভাযা অধ্যয়ন করিয়া বিলক্ষণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। সিংহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাহারা জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে তথায় একটী বক্তৃতা দেয়, তাহাতে তথাকার বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এবং পালীভাষা বিশারদ বৌদ্ধসাধুগণ উপস্থিত থাকেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যার্থিগণ পালীভাষায় সুদক্ষ হইয়াছে দেখিয়া তথাকার সুমঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাহাদের প্রতিষ্ঠাপত্র এবং তালপাতায় লিখিত গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে শ্রীধর্ম্মবিজয় মহারাজ এত ব্যয় করিয়া

তাহাদের সিংহল পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। মুণিমহারাজ বিদ্যার্থী দুইজনকে এই অভিপ্রায়ে পাঠাইয়াছিলেন যে জৈন এবং হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধমতের পূর্ব্বপক্ষ যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, সে বিষয়ের মূল পালীভাষার গ্রন্থে আছে কি না, তাহাই তাহারা জানিয়া আসিবে। পরন্তু সিংহলে বৌদ্ধসাধুগণ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন না, তজ্জন্য কেবল ভাষা শিক্ষা দিয়া তাঁহারা বিদ্যার্থিদের বিদায় দিয়াছেন। মুণিমহারাজ ঐ দুইজনকে এক্ষণে তির্ব্বত এবং ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার ইচ্ছা করিতেছেন। ঐ দুই বিদ্যার্থী—বিদ্যার্থী কেন, মহাপণ্ডিতের সহিত একবার আমরা কাশীতে মিলিত হইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম।

লুপ্ত জৈনগ্রন্থের উদ্ধার এবং উহার প্রচার করা শ্রীধর্ম্মবিজয় মহারাজের জীবনের একটী প্রধানউদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার অভিপ্রায়ে ইনি পাঠশালা হইতে "শ্রীযশোবিজয় জৈনগ্রন্থ মালা" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ অবধি উহা হইতে পনের ষোল খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ; গ্রন্থমালা প্রতিমাসেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য পাঠশালায় একটী ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে ; ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কেবল যে জৈনধর্ম্মের উপকার হয় তাহা নহে, পরন্তু উহাতে প্রাচীন ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্বের নানাবিধ বিষয় সংগ্রহ হইতেছে।

শ্রীবিজয়ধর্ম্মস্থরি শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য, ইনি অতিশয় দৃঢ়ব্রত এবং সত্যনিষ্ঠ, ইহাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জৈনপাঠশালায় কেবল জৈনবিদ্যার্থিগণকে নহে, পরন্তু হিন্দু-বিদ্যার্থিদিগকেও শিক্ষাদান করা হয়। ইনি উভয়ের প্রতি সমানদৃষ্টি রাখেন এবং উভয়ের অভাবমোচনের জন্য একইরূপ চেষ্টা করেন। ইহাঁর অভিপ্রায় এই যে, প্রকাশ্যরূপে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, জৈনধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মপালন করা হইবে। জৈনধর্ম্মকে ইনি ভারতের আদি এবং মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন ; ইহাঁর ইউরোপ প্রদেশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে। জৈনশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং ধর্ম্মপ্রচার-সমর্থ দুই তিনটী ছাত্রকে ইনি ইউরোপ পাঠাইবার মতলব করিতেছেন ; ইউরোপে যে সকল বিদ্বান জৈনশাস্ত্র এবং জৈনধর্ম্মের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান, মুণিমহারাজ জৈনশাস্ত্রের প্রাচীনগ্রন্থ সকল পড়িবার জন্য তাঁহাদের পাঠাইয়া থাকেন এবং পত্রের দ্বারা তাঁহাদের সংশয় অপনোদন করিয়া থাকেন। "বিবলীওথিকা ইণ্ডিকা" নামক পুস্তকের অন্তর্গত যোগশাস্ত্র প্রভৃতি পুস্তক সকলের সম্পাদন কার্য্য ইনি

স্বয়ং করিয়া থাকেন, এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের বহুবিধ প্রাচীন জৈনগ্রন্থের সম্পাদন কার্য্যে ইনি সহায়তা করেন। ইহা ভিন্ন জৈনতত্ত্ব দিগ্‌দর্শন, জৈনশিক্ষা দিগ্‌দর্শন, আত্মোন্নতি দিগ্‌দর্শন, অহিংসাদিগ্‌দর্শন, পুরুষার্থদিগ্‌দর্শন. ইন্দ্রিয়পরাজয় দিগ্‌দর্শন প্রভৃতি অনেক পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহাঁর বিচারগাম্ভীর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারে জীবের কিসে মঙ্গল হয়, সেই চিন্তায় ইনি সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন; ভূতদয়া, অহিংসা এবং স্বার্থত্যাগ ইহাঁর মূলমন্ত্র। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগর হইতে এসিয়াটীক্ সোসাইটীর জর্ণলের ন্যায় একখানি পত্র বাহির হয়, তাহার নাম "জর্ণল এসিয়াটীকী" (Journal asiatique); গতবর্ষে সেই পত্রে কোন এক ফরাশী বিদ্বান শ্রীবিজয়ধর্ম্ম-সূরি মহারাজের জীবন চরিত প্রকাশিত করেন, এবং তাহাতে ইহাঁর গুণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি কাশীতে একটী পশুশালা স্থাপিত করিয়াছেন, মহারাজ কাশীপতি সেই পশুশালার সংরক্ষক। ইনি অতিশয় মহাত্মা, ইহাঁর কয়েকবার দর্শনলাভে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

"সরস্বতী"

অর্হম্
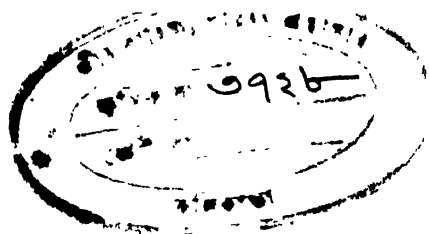
শান্তমূর্ত্তি শ্রীবৃদ্ধিচন্দ্র গুরুভ্যো নমঃ।

অহিংসা দিগ্দর্শন।

নত্বা কৃপানদীনাথং জগদুদ্ধারকারণম্।
অহিংসাধর্ম্মদেষ্টারং মহাবীরং জগদ্গুরুং ॥ ১ ॥
মুনীশং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞং বুদ্ধিচন্দ্রং গুরুং তথা।
সমদৃষ্ট্যা দয়াধর্ম্মব্যাখ্যানং ক্রিয়তেময়া ॥ ২ ॥
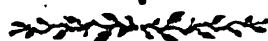
অনাদিকাল হইতে এই সংসারে প্রাণিমাত্রেই নূতন নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম, জরা, মরণ প্রভৃতি অসহ্য দুঃখে দুঃখিত হইতেছে, উহার মূল কারণ কর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ নাই। এই জন্য সমগ্র দর্শনশাস্ত্র প্রণেতাগণ ঐ কর্ম্ম বিনাশ হেতু শাস্ত্রে যে সকল উপায় বলিয়া গিয়াছেন, উহার মধ্যে সামান্যধর্ম্মরূপ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, নিস্পৃহতা, পরোপকার, দানশালা, পশুশালা, কন্যাশালা, বিধবাশ্রম, অনাথাশ্রম প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র প্রণেতাগণের অভিমত, কিন্তু বিশেষ ধর্ম্মরূপ স্নান সন্ধ্যাদি উপায় মধ্যে মতের বিভিন্নতা আছে, অতএব এ স্থলে বিশেষ ধর্ম্মের আলোচনা না করিয়া কেবল সামান্যধর্ম্ম বিষয়ে

বিচার করাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তন্মধ্যে শাস্ত্র-কারগণের অত্যন্ত বল্লভা দয়া দেবীর বিষয়, লেখকের স্ববুদ্ধি অনুসারে বিস্তারক্রমে বর্ণন করিবারই ইচ্ছা। উহার আক্ষেপরাহিত্য পরিপূর্ণ করিবার জন্যই লেখকের প্রবৃত্তি। দয়ার স্বরূপ—লোক ব্যবহার, অনুভব এবং শাস্ত্রের উদাহরণ দ্বারা লিখিত হইতেছে; তন্মধ্যে প্রথমতঃ যদ্যপী লোক ব্যবহারের সহিত বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, যে পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রাণির অন্তঃকরণে অবশ্যই দয়ার সঞ্চার আছে; যেমন্ কোন বলবান্ জীব পথিমধ্যে কোন দুর্ব্বল জীবকে আক্রমণ করিলে, অপর পুরুষ বলবান্ হইতে দুর্ব্বলকে বাঁচাইবার জন্য অবশ্যই যত্নবান্ হয়। কোন চোর রাস্তামধ্যে কোন ব্যক্তির দ্রব্যজাত অপহরণ করিতে থাকিলে, ঐ ব্যক্তির চিৎকার শুনিয়া অন্যান্য লোক একত্রিত হইয়া ঐ চোর ধরিবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিয়া থাকে, ঐরূপ অতি তুচ্ছ জীব হইলেও বলবান্ জীব যদ্যপী উহাকে মারিতে থাকে, তবে উহাকে ছাড়াইবার চেষ্টা লোকে অবশ্যই করিয়া থাকে। যদ্যপী ছোট পক্ষিকে বড় পক্ষী, বড় পক্ষিকে বাজ, বাজকে বিড়াল, বিড়ালকে কুক্কুর, এবং কুক্কুরকে ডোম প্রহার করে, তবে দর্শকবৃন্দ উহাকে ছাড়াইবার প্রযত্ন অবশ্যই করিবে। এমন কি যাঁহাকে হিন্দুগণ ভগবান্ কহিয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণের কপটাচরণ সময়ে অনীতি দেখিয়া লোকে এক সময়ে উহাঁর কার্য্যের প্রতিও নিন্দা করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। ভারতযুদ্ধ সময়ে চক্রব্যূহ মধ্যে অভি-মন্যুর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে কপটতা করিয়াছিলেন, উহা শ্রবণ

করিয়া অন্যাপী ভক্তজন মাত্রেই সেই শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে প্রস্তুত হয়। ইহাতে ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে মনুষ্যের চিত্ত-বৃত্তি স্বভাবতঃই দয়াশীল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রসনেন্দ্রি-য়ের লালসা বশতঃ লোকে অকার্য্যও করিয়া থাকে, অর্থাৎ মাংসাহারে লুব্ধ হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করে, যেহেতু মাংসা-হারী সহস্র দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিলেও, এক অভক্ষ্য আহার করিয়া আপনার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় করিয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য যতই পরিপাটী হউক না কেন, উহাতে যদ্যপী কনা মাত্র বিষ মিশ্রিত হয়, তবে উহা গ্রহণের বিষয় থাকে না ; সেইরূপ মাংসাহারী ব্যক্তি যদ্যপী অশেষ শুভকর্ম্ম করে, সেই শুভকার্য্য মাংসাহার জন্য অশুভ হইয়া যায়, কারণ যাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার নাই, উহার হৃদয় হৃদয় না হইয়া প্রস্তরই হইয়া থাকে। মাংসাহারী ঈশ্বর ভজন, সন্ধ্যাদি কোনরূপ ধর্ম্ম কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে না, উহার কারণ এই, যে স্নান না করিলে সন্ধ্যা কিম্বা ঈশ্বর উপাসনাদি পুণ্যকার্য্য করা নিষেধ, এবং "মৃতং স্পৃশেৎ স্নানমাচরেৎ" এই বাক্যপ্রমাণ, মৃত স্পর্শ করিলে স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য! অতএব এ স্থলে বিচার করা বিধেয় যে ছাগল, মহিষ, মৎস্য প্রভৃতির মাংস মৃতদেহ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ঐ মৃতমাংস খাইলে স্নানশুদ্ধি কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কারণ মাংসের ভাগ উদরে শীঘ্র জীর্ণ হয় না, সুতরাং বাহ্যস্নান কিরূপে শুদ্ধ হইবে? এই হেতু বরাহ পুরাণে বরাহঋষি বসুন্ধরাহইতে আপনার বত্রিশ অপরাধীর মধ্যে মাংসাহারীকে অষ্টাদশ অপরাধী কহিয়াছেন ; ঐ প্রকরণ মধ্যে লিখিত হইয়াছে :—

"যে মাংসাহার করিয়া আমার পূজা করিবে সে ব্যক্তি অষ্টাদশ অপরাধে অপরাধী হইবে"—যথাঃ—

"যস্তু মাৎস্যানি মাংসানি ভক্ষয়িত্বা প্রপদ্যতে।
অষ্টাদশাপরাধং চ কল্পয়ামি বসুন্ধরে॥"

কলিকাতা গিরীশ বিদ্যারত্ন প্রেসে মুদ্রিত পত্র ৫০৮ অঃ ১১৭ শ্লোঃ ২১।

"যস্তু বারাহমাংসানি প্রাপণেনোপপাদয়েৎ।
অপরাধং ত্রয়োবিংশং কল্পয়ামি বসুন্ধরে॥"

ঐ ঐ শ্লোঃ ২৬।

"সুরাং পীত্বাতু যো মর্ত্ত্যঃ কদাচিদুপসর্পতি।
অপরাধং চতুর্বিংশং কল্পয়ামি বসুন্ধরে॥"

ঐ ঐ শ্লোঃ ২৭।

সজ্জনগণ! কেবল ইহাই নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষদোষ জন্য ও মাংসাহার সর্ব্বথা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, দেখুন মাংসাহারীর দেহ হইতে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং উহার ঘর্ম্মেও দুর্গন্ধ হয়। জীবগণের স্বভাব যদ্যপী এইরূপই হয় যে উহারা যখন যে কার্য্য করে, উহা তাহাদিগের উত্তম বলিয়া অনুভব হয়, তথাপী তাহাদের বিচার করা উচিৎ যে যাহার মাংসের প্রতি বিশেষ আশক্তি জন্মে, তাহারই পক্ষে মাংস উত্তম বিবেচিত হয়, এবং সে উহাকে অন্যের নিকট উত্তম খাদ্য বলিয়া প্রশংসা করে; যেরূপ মদ্যপায়ী ঔষধ রূপে প্রথগতঃ মদ্যপান করে, পশ্চাৎ উহাতে আশক্ত হইয়া পড়ে। মাংসাহারী মাংসপাকপাত্র এবং তাহার হস্তদ্বয় পরিষ্কার করিতে বিশেষ ক্লেশ পায়, মৎস এবং মাংস খাইবার পর মুখ হইতে লাল নির্গত হয় এবং উহার দুর্গন্ধ পান, সুপারী

প্রভৃতি আহার না করিলে অপগত হয় না। এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি ঐ আহারকে উপাদেয় মনে করে, এমন কি অস্ত্র চিকিৎসকের ন্যায় উহার মাংসাদিতে ঘৃণাও ক্রমশঃ অপসৃত হয়। অস্ত্র চিকিৎসক প্রথমতঃ শবদেহচ্ছেদ করিতে অবশ্যই অল্প পরিমাণেও ঘৃণা অনুভব করে, পশ্চাৎ অভ্যাশ বশতঃ ঐ অত্যল্প ঘৃণাও ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়, মাংসাহারীর অবস্থাও ঠিক্ সেইরূপ হইয়া থাকে! যদ্যপী মৎস্যাদি ভক্ষককে জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে জানা যায় যে মৎস প্রভৃতি কাটিলে যে জল নির্গত হয়, উহা এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত যে ঘ্রাণ মাত্রেই মনুষ্যের বমন হয়। হায়! এরূপ ঘৃণিত বস্তু সৎব্যক্তি কি প্রকারে আহার করিতে পারে? ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। বনস্পতি, মনুষ্যের সর্ব্বথা সুখকর হইলেও উহার পুষ্প যদ্যপী দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে উহা মনুষ্য পরিত্যাগ করে, কিন্তু মল মূত্র রুধির আদিতে সংযুক্ত পচা এবং ক্রিমী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ মাংসাদি যদ্যপী মনুষ্য ত্যাগ না করে, তবে উহাকে মনুষ্য কি প্রকারে কহা যায়?

কোন কোন মাংসাহারী কহেন যে মাংস আহার করিলে শরীরের বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়; এরূপ কহাও তাহাদের ভ্রম, কারণ যদ্যপী মাংস খাইলেই বল বৃদ্ধি হয়, তবে সিংহ হস্তি অপেক্ষা অধিক বলবান্ হইত; সিংহ হস্তি অপেক্ষা অধিক ভার কখনই সহ্য করিতে পারে না। যদ্যপী কেহ এরূপ কহে যে, সিংহ হস্তি অপেক্ষা অধিক বলবান্ না হইলে, হস্তিকে সিংহ অনায়াসে কিরূপে

সংহার করে? ইহার উত্তর এই যে হস্তি শাকান্নভোজী বলিয়া শান্তস্বভাব হয়, আর সিংহ মাংস আহার করে বলিয়া ক্রূরস্বভাব হয়, এই জন্য সিংহ হস্তিকে পরাস্ত করে, নতুবা হস্তি করব্বরা যদ্যপী সিংহকে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে উহাকে তিল তিল করিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়। অতএব মাংস ভক্ষণ করিলে যে ক্রূরতা বৃদ্ধি পায় ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। ক্রূরতা কোনরূপ পুণ্যকার্য্যকে সম্মুখে থাকিতে দেয় না, এবং ইহাও সকল লোকের বুঝা কর্ত্তব্য যে মাংসাহারী ব্যক্তি নিজগৃহে কলহ উপস্থিত হইলে মারপিট হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে না, উহার ঐরূপ ব্যবহার কি নির্দয়তার পরিচয় নহে? এই জন্য বুঝাযায় যে নির্দয়তাও মাংসাহারীর একটী সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

এক্ষণে বীর্য্যের বিষয় কথিত হইতেছে—বীর্য্যও মাংসের গুণ নহে, কিন্তু পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কারণ যদ্যপী কেহ নপুংষক্‌কে বীর্য্যবান্ করিতে ইচ্ছা করিয়া সহস্র সহস্র উত্তম পদার্থ খাইতে দেয়, তথাপি যুদ্ধের সময় নপুংসক অবশ্যই পলায়ন করিবে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি দেশের মনুস্য প্রায়ই মৎস ও মাংসাহারী হইয়া থাকে। উহাদের পঞ্চাশ ব্যক্তি একত্র হইলেও ছাপরা জেলার মাত্র চারিজনের নিকট পরাস্ত হয়, পরন্তু ছাপরা জেলার লোক প্রায়ই ছাতু আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গুরুগোবিন্দ সিংহের শিষ্য সিখগণ প্রায়ই ফল আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তত্রাচ যুদ্ধের সময় কেল্লা জয় করিয়া বীর্য্যের প্রাধান্য দেখাইয়া

গিয়াছে ; তাহার কারণ এই যে, ফলাহারী স্থিরচিত্তে যেরূপ যুদ্ধ করিতে পারে, মাংসাহারী কদাচ সেরূপ পারে না। উহার দ্বিতীয় কারণ—মাংসাহারীর শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন নির্গত হয়, পরন্তু ফলাহারীর শরীর উষ্ণ হয় না এবং নিশ্বাসও দ্রুত নির্গত হয় না।

পাঠকগণ ! আপনারা অবশ্যই শুনিয়াছেন যে রুষ ও জাপানের ঘোরতর যুদ্ধে কাঁচামাংসাহারা ভয়ানক রুষকে, মিতাহারী ও বিচারশীল জাপান বীর পরাস্ত করিয়া জগতে কিরূপ আশ্চর্য্য জয়পতাকা উড়াইয়াছে ! যদি মাংস আহার করিলে বীরতা বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে রুষের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল এবং মাংসও যথেষ্ট আহার করিত, তথাপী রুষেরই পরাজয় কেন্ হইল ? ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পরাজয়ের মূল কারণ অস্থিরচিত্ততা।

মাংসাহার মনুষ্যের প্রকৃতিগত না হইলেও, ইন্দ্রিয়ের আশক্তি বশতঃ যে কোন অবিবেকী ব্যক্তি মাংসাহার করে, উহার অশুভ ফল সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ মাংসাহারী প্রায়ই মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত এবং নিষ্ঠুর হইয়া থাকে। যদিও কোন কোন মাংসাহারী ঐরূপ দোষগ্রস্ত না হয়, তথাপি উহার শরীর নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। যে হেতু মৎস ও মাংস আহারান্তে সম্পূর্ণ জীর্ণ না হইলে ভোক্তার রাত্রিতে নিদ্রার সময় অসহ্য উদ্গার হয়, শরীরের রক্ত দূষিত হয় এবং শরীর বিবর্ণ হয়, হাত পা জ্বালা করে, উদর স্ফীত হয়, কোন কোন লোকের পা ফুলিয়া উঠে এবং গলদেশও স্ফীত হইয়া থাকে, এবং ইহাও দেখা যায় যে

অনেক মাংসাহারী কুষ্ঠাদি অসহ্য রোগে পীড়িত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি কোনরূপে কেহ ঐরূপ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পায়, তবে উহা তাহার পাপানুবন্ধী পুণ্যেরই কারণ বুঝা উচিত। অর্থাৎ যখন তাহার ঐ পুণ্য ক্ষয় হইবে, তখন জন্মান্তরে সে পাপের অসহ্য যন্ত্রনা অবশ্যই ভোগ করিবে। মাংসাহারীর মৃত্যুও অতিশয় দুঃখে হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর প্রাক্কালে নানারূপ প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য রোগও উৎপন্ন হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন।

ফলই মনুষ্যের প্রকৃতিগত আহার, কারণ মনুষ্যের দাঁত হইতে মাংসাহারীর দাঁতের বৈলক্ষণ্য আছে, উহার জঠরাগ্নিও মনুষ্য হইতে ভিন্ন ভাবে গঠিত হইয়াছে, এবং উহার স্বভাবও বিচিত্র দেখা যায়। মাংসাহারী মাত্রেই জিহ্বা দ্বারা জল পান করে, কিন্তু মনুষ্য মুখের দ্বারায় পান করিয়া থাকে। অতএব ইহাই স্থির হইল যে মনুষ্য জাতি স্বাভাবিক মাংসাহারী নহে, তথাপী যাহারা মাংসাহার করে তাহাদিগকে রাক্ষস গণনা করা উচিত।

মুসলমান্ ও হিন্দু জাতির মধ্যে আহার এবং পানীয় ব্যবহারে বিশেষ ভেদ দেখা যায়। মুসলমানের হাতের জল হিন্দু পান করে না এবং উহার আসনেও বসিতে চাহে না, পরন্তু মুসলমান হিন্দুর হাতের জল পান করিতে অথবা উহার আসনে বসিতে সঙ্কুচিত হয় না। ইহার কারণ এই যে মুসলমানের প্রধান খাদ্য মাংস, যদ্যপী হিন্দুও ঐরূপ ব্যবহার করে, তবে উভয় জাতির পার্থক্য কি রহিল? যেরূপ মুসলমান্

লোকে প্রায় বক্‌রীদের সময় ছাগল প্রভৃতি পশু বধ করে, অনেক হিন্দুগণও নবরাত্র প্রভৃতি উৎসবের সময় সেই রূপই পশু বধ করে, মুসলমান স্বজাতীয় ভোজনাদি কার্য্যে মৎস ও মাংস প্রচুর পরিমানে ব্যবহার করিলে উহা যেরূপ উত্তম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, হিন্দুগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে হরিণ প্রভৃতির মাংস ব্যবহার করিলে উহাও সেই রূপ উত্তম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং মুসলমান যেরূপ খোদার আদেশ অনুসারে জীব হিংসা করিলে পাপ নাই মনে করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে, হিন্দুগণও সেইরূপ দেবীপূজা, যজ্ঞক্রিয়া, মধুপর্ক, শ্রাদ্ধকার্য্য প্রভৃতিতে জীব হিংসাকে পাপ মনে না করিয়া অহিংসাই গণনা করে, অধিকন্তু পশু ও হত্যাকারী উভয়ের সদ্‌গতি হইল মনে করে। এক্ষণে এস্থলে মধ্যস্থ দৃষ্টিতে বিচার করিলে মুসলমান ও হিন্দুর বিশেষ ভেদ উপলব্ধি হয় না, কারণ যে হিন্দু মাংস আহার করে না এবং মুসলমানের হাতের জল খায় না, সে অবশ্যই সৎপথে অবস্থিত আছে, পরন্তু যে মাংস আহার করে ও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ড তাহার সংশয় নাই, কারণ মৃত্যুর পর উভয়েরই দুর্গতি হইবে এবং উভয়কেই এক রাস্তায় চলিতে হইবে। এই বিষয়ে কবীর কহিয়াছেন—

"মুসলমান্ মারে করদ্ সো হিন্দু মারে তরবার।
কহেঁ কবীর দোনো মিলি জৈঁহে যম্‌কে দ্বার" ॥

এইজন্য মাংসাহারী হিন্দুকে আর্য্য বলা উচিত নহে, যেহেতু আর্য্যশব্দ উহার প্রতি ব্যবহার করা বিধেয়, যাহার হৃদয়ে দয়াভাব, প্রেমভাব, শৌচাদি ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, কিন্তু

মাংসাহারীর হৃদয়ে দয়াভাব অথবা প্রেমভাব কিছুই নাই।

কোন সময়ে এক মাংসাহারী আমার নিকট আসিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকিলে, আমি তাহার অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে উত্তরে আমাকে কহিল যে "আমার মত নির্দয় এবং কঠোরহৃদয় পুরুষ এই সংসারে দ্বিতীয় নাই, যেহেতু কিছু দিন হইল আমি অতি সুন্দর একটী ছাগল পুষিয়াছিলাম, সে আমাকে পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রেম দেখাইত, আর আমিও তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতাম; আমার হস্ত হইতে ঘাস দানা ইত্যাদি না পাইলে খাইত না এবং আমি যখন বাহিরে যাইতাম, ফিরিয়া আসিতে দেরি দেখিলে, সে বাহিরে গিয়া রাস্তা চাহিয়া থাকিত এবং ব্যাঁ ব্যাঁ করিয়া ডাকিত; যদি দুই এক দিন বাটীতে না আসিতাম, সে আহার করিত না এবং আমি আসিলে বড়ই খুসী হইত। সেই ছাগল আমি নিজ হস্তে মাংসের লোভে বধ করিয়াছি এবং বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়াছি। মৃত্যুর সময় ঐ ছাগলের যে অবস্থা দেখিলাম, তাহা আপনি শুনিলে আমাকে চণ্ডাল বলিবেন। হায়! যখনই ঐ ছাগলের কথা আমার মনে হয়, তখনই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়"। আমি শুনিয়া তাহাকে মাংস ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলাম। সেই অবধি সে মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিয়াছে। এই জন্য আমি নিশ্চয় ও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে মাংসাহারী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী। অন্যান্য অকার্য্য অপেক্ষা জীবহিংসা যে সর্ব্বাপেক্ষা দূষণীয় তাহার সংশয় নাই।

যদি কোন মাংসাহারী এরূপ কহে যে আমি হিংসা করিনা এবং আমার জন্য হিংসা হয়না, এরূপ কহাও তাহার বৃথা, কারণ যদি কেহই মাংস ভক্ষণ না করে, তবে ঘাতক কি জন্য জীবহিংসা করিবে ? অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ, এক জীবের হিংসা করিলে আটজন পাতকের ভাগী হয়। যথা—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ" ॥

অর্থাৎ পশুহননের পরামর্শদাতা, মৃতপশুর মাংসছেত্তা, ঘাতক, ক্রেতা, বিক্রেতা, সংরক্ষক, পাচক এবং ভক্ষক, ইহারা সকলেই ঘাতক নামে অভিহিত হয়।

এস্থলে কোন কোন মাংসাহারী এইরূপ প্রশ্ন করেন যে ফলাহারীও তবে ঘাতক ? কারণ শাস্ত্রে উদ্ভিৎপদার্থকেও জীব কহিয়া থাকে, অতএব ধর্ম্মান্ধ ফলাহারী কিজন্য মাংসাহারীর উপর বৃথা আক্ষেপ করেন ? ইহার উত্তর এই যে, জীব আপন ২ পুণ্য অনুসারে উত্তরোত্তর যেমন ২ উচ্চ পদবী প্রাপ্তি হয়, তদনুসারে তাহাকে অধিক পুণ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, এইজন্য একেন্দ্রিয়, দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয়, এবং পঞ্চেন্দ্রিয় এই পাঁচ প্রকার মূলভেদ জীবেতে লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে এক অপেক্ষা দুই, দুই হইতে তিন, এবং তিন হইতে চারি ইন্দ্রিয়বিশিষ্টজীব অধিক পুণ্যবান্। এইরূপে পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুঝা উচিত। পরন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের ভিতরও ন্যূনাধিক পুণ্যবান্ আছে ; যেমন তীর্য্যক্ পঞ্চেন্দ্রিয় বরাহ, গো, মহিস প্রভৃতি হইতে হস্তি

অধিক পুণ্যবান্ ; এবং মনুষ্যের মধ্যে রাজা, মণ্ডলাধীশ, চক্রবর্ত্তী এবং যোগী অধিক পুণ্যবান্ বলিয়া অবধ্য হইয়াছেন; রাজা সংগ্রামে ধৃত হইলে বধার্হ নহেন। ইহাতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে একেন্দ্রিয় অপেক্ষা দ্বীন্দ্রিয় জীবকে বধ করিলে অধিক পাপ হয়, এইরূপ উত্তরোত্তর অধিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব বধ করিলে উত্তরোত্তর অধিক পাপই হইয়া থাকে। এইজন্য যাবৎ একেন্দ্রিয় জীবের দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাবৎ পঞ্চেন্দ্রিয় জীবহিংসা সর্ব্বথা অযোগ্য। একেন্দ্রিয় জীবহিংসাতেও পাপানুবন্ধের কারণ আছে সত্য, পরন্তু গৃহস্থের উপায়ান্তর না থাকায় ঐ হিংসাকার্য্য অগত্যা করিতে হয়। এই পাপভয়ে ভীত হইয়া কত শত ভব্য মনুষ্য ধন, ধান্য, রাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সাধুপথ অবলম্বন করিতেছেন, কেহ কেহ যাবজ্জীবন অগ্নি আদি স্পর্শ করেন না, কেবল ভিক্ষামাত্র অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ ব্যক্তিও একেন্দ্রিয় জীবহিংসাজন্য যে পাপ উৎপন্ন হয়, উহা নিরাকরণের নিমিত্ত সাধুসেবা দান, ধর্ম্ম এবং উভয়সন্ধ্যা দেবোপাসনাদি পুণ্যকার্য্য আজীবন করিয়া থাকেন।

ভিক্ষামাত্রউপজীবী সাধুগণকে প্রারম্ভদোষ স্পর্শ করে না, কারণ গৃহস্থব্যক্তি আপনার জন্য যে আহার প্রস্তুত করে, সেই আহার্য্য হইতে সাধুগণ জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী নির্দ্দোষসামগ্রীমাত্রই গ্রহণ করেন, এবং গৃহস্থও জানিতে পারে না যে অদ্য তাহার গৃহে সাধুসমাগম হইবে। গৃহস্থের ভোজন কালে সাধু তাহার গৃহে উপস্থিত

হইয়া সময়োচিত এবং অনায়াসলব্ধ অন্ন গ্রহণ করেন, তজ্জন্য পূর্ব্বকাল অথবা উত্তরকালজনিত কোনরূপ দোষ সাধুকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যদ্যপি এ স্থলে কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে সাধুগণের সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যের তবে প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, আহার বিহারাদির জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া গমনাগমনাদিকার্য্যদ্বারা যে অনুপযোগরূপ পাপ উৎপন্ন হয়, উহার প্রায়শ্চিত্তহেতু সাধুগণ ক্রিয়া করিয়া থাকেন। মহাশয়গণ! "যেমন আহার তেমনই বিচার" এই সামান্য লোকব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই অনুভূত হয় যে, উত্তম সামগ্রীর আহার হইতে উত্তম, মধ্যম আহার হইতে মধ্যম এবং তুচ্ছ আহার হইতে তুচ্ছ বিচারশক্তি উৎপন্ন হয়, এইজন্য শাস্ত্রোক্ত মহাত্মাগণ যখন যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হন্, তখন তাঁহাদের আহারের পরিমান যেরূপ অল্প হয়, উহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুগের দাল ও চাউল এবং তাহার সহিত কোনরূপ বনস্পতির তরকারি হইলেই সর্ব্বোত্তম আহার হইল, কারণ ভাত হাল্‌কা এবং পুষ্টিকারক, এইহেতু প্রায় সকল দেশেই এই আহারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে, এবং ভাত আহার করিলে বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে অল্পজ্ঞতা এবং রসনেন্দ্রিয়ের লোভপরতন্ত্র হইয়া লোকে এই উত্তম খাদ্যের সহিত কুৎসিত মাংস মিশ্রিত করিয়া অন্নের স্বতন্ত্র ও সর্ব্বোত্তম গুণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছে, এবং অতি সামান্য গুণ যাহা অবশিষ্ট আছে, উহাকে ভুল

ক্রমে মাংসেরই গুণ মনে করিতেছে! যদ্যপী মৎস ও মাংস পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যজাতির ভাত ও দাল আহার প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গ আদি দেশের লোকের বুদ্ধিবল কতই বর্দ্ধিত হইত! আজ কাল ইংলণ্ডবাসীর বুদ্ধির প্রাখর্য্য কেবল ভাতের প্রতাপেই হইয়াছে। যদিও বুদ্ধি আত্মারই মুখ্য গুণ বটে, তথাচ বায়ুর প্রাবল্যহেতু উহা মলিন হইয়া যায়, এবং বায়ু মাংসাহার দ্বারা বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এইজন্য মাংসাহারীকে জঙ্গলী নির্ব্বোধ বলা যাইতে পারে। কোন কোন দেশে মাংসাহারীকেও বিশেষ বুদ্ধিমান দেখা যায় বটে, পরন্তু উহার কারণ এই যে ঐ দেশে স্বভাবতঃ বায়ুর প্রকোপ কম হইয়া থাকে। যে আহারের দ্বারা বায়ুর প্রকোপ কম হয়, ঐ আহারই উত্তম গণনা করা যায়; চাউল, দাল ও বনস্পতি আহারে বায়ু বৃদ্ধি হয় না, এজন্য উহা উত্তম আহার, কিন্তু গমের রুটী, অড়হর দাল মধ্যম আহার, কেননা উহাতে বুদ্ধির বৃদ্ধি ও হ্রাস উভয়ই হইবার সম্ভাবনা, পরন্তু মাংস বায়ু-বৃদ্ধিকারক বলিয়া উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধম আহার গণনা করা যায়। অতএব মনুষ্য উত্তম আহারই গ্রহণ করিবে এবং অধম সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। যে সকল দেশে মাংসাহার বিশেষ প্রচলন আছে, ইতিহাসে ঐ সকল দেশকে অসভ্যদেশ বলিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ সর্ব্বদা এবং সর্ব্বথা শিল্পকলা, ধর্ম্মকলা আদিতে প্রবীণ বলিয়া অসভ্যদেশ মধ্যে পরিগণিত নহে। এক্ষণে দেখাযায় যে এই ভারতবর্ষের নানাবিভাগে এবং নানাজাতি ও ধর্ম্মের মধ্যে মাংসাহার

প্রবেশ করিয়াছে, উহার কারণ এই যে শ্রীমহাবীরস্বামীর তিরোভাবের পর হইতে দ্বাদশবর্ষকালব্যাপক অকাল উপর্য্যুপরি তিনবার ঘটিয়াছে। ঐ সময় অন্নাভাবে অনেক লোক জীবনরক্ষারকারণ মাংসাহারী হইয়াছে, এবং অকাল ধীরে ২ অপগত হইলেও, অভ্যাসবশতঃ মনুষ্যের মাংসাহার নিবৃত্ত হয় নাই। তখন হইতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণও পূর্ব্বভারতে বিধর্ম্মী মুসলমান রাজাগণের উপদ্রবে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই লোকের অহিংসা-ধর্ম্মের উপদেশ অভাব হইয়াছিল।

কোন কোন কল্যাণাভিলাষী সাধুপ্রকৃতির মনুষ্য মাংসাহারী ব্রাহ্মণকে এরূপ প্রশ্ন করেন যে "মহারাজ! শাস্ত্রে মাংসাহারীর বিশেষ দণ্ডবিধান আছে, এমন কি পশুর গাত্রে যতগুলি রোম আছে, মাংসভক্ষক তত হাজার বৎসর ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, অতএব মাংসাহারী আপনাদের কোন্ গতি হইবে?" ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণ বলেন যে, অবিধিপূর্ব্বক মাংসভক্ষণে নরক হয়, পরন্তু বিধিপূর্ব্বক আহার করিলে ধর্ম্মই হইয়া থাকে। অতএব তোমরাও যদ্যপি দেবীপূজা কিম্বা শ্রাদ্ধাদিতে মাংস ভোজন কর, তাহাতে হানি নাই।" ব্রাহ্মণগণ এইরূপ উপদেশ প্রচার করিয়াছেন এবং কল্পিত নানারূপ শ্লোকও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দেখুন—স্বার্থে এবং ইন্দ্রিয়ের আস্বাদে লুব্ধ হইয়া বৃথা কীর্ত্তিস্থাপনের জন্য ঐ সকল ব্যক্তি কতদূর অনর্থ করিয়া গিয়াছেন! এখানে বিচার্য্য এই যে, যদি হিংসা হইতে

ধর্ম্ম হয়, তবে অধর্ম্ম কিসে হইবে ? কারণ মাংসাহারীর মন প্রায়ই দুঃখিত এবং মলিন থাকে এবং কোন জীবকে দেখিলে উহার মনে হয় যে, "এই জীব কেমন সুন্দর, ইহার মাংস কেমন স্বাদু ও পুষ্টিকর এবং ইহার মাংস প্রচুর পাইব"। এইজন্য মাংসাহারী ব্যক্তি বনে গেলেও হরিণ প্রভৃতি জীব দেখিলে উহাকে ধরিবারই ইচ্ছা করিয়া থাকে। অথবা ঐ ব্যক্তি নদী ও পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী হইলে মৎস্য দেখিয়া উহা হত্যা করিবার অভিলাষ করে। এইরূপে হিংস্রক ব্যক্তি অষ্টপ্রহর রুদ্রমূর্ত্তী ধারণ করিয়া থাকে। যেরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়ালাদি হিংস্রকপ্রাণি, আহারের নিমিত্ত কোন জীব না পাইলেও, হিংসাপ্রবৃত্তিহেতু কর্ম্মবন্ধনজনিত নরকাদি নীচগতি অবশ্য প্রাপ্ত হয়, মাংসাহারী ব্যক্তির ঠিক্ সেই দশা হইয়া থাকে। অহো! মাংসাহারা বনমধ্যে সুশ্রী পক্ষীকুল হত্যা করিয়া বন শূন্য করিয়া দেয়, এবং সুন্দর সুন্দর উপবনে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, সানন্দে পক্ষীদিগকে বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা হনন করিয়া বৃক্ষ হইতে ভূমে নিপাতিত করে! আমার বিশ্বাস যে ঐ সময়ের বীভৎস দৃশ্য সদয় পুরুষ কখনই দেখিতে সক্ষম হন না, পরন্তু নির্দয় মাংসাহারী উহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত বধকর্ত্তাকে এই বলিয়া উত্তেজনা করে যে, "বাঃ! এক্ গুলিতে কেমন্ পক্ষীবধ করিল দেখ!"

প্রথমতঃ এস্থলে বিচার করা উচিত যে পক্ষীহন্তা একটী পক্ষীকে হনন করিল বটে, পরন্তু এক জীবের হিংসা হইতে তাহার অনেক জীবহিংসা সাধিত হইল; কারণ যে পক্ষিটী

মরিল, যদি সে স্ত্রীজাতি হয় এবং তাহার ছোট ছোট শাবক থাকে, তবে জননীর মৃত্যুতে শাবকগণ জীবিত থাকিবে না, সুতরাং সকলের মৃত্যুজনিত ঘোরপাপ বধকারীকে অবশ্যই স্পর্শ করিবে। এইজন্য কর্ম্মবন্ধনের প্রাক্‌কালে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তির সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় বিচার্য্যবিষয় এই যে, হিংসা না করিয়া মনুষ্য পক্ষীগণকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিলেও ঘোর কর্ম্মবন্ধনে পতিত হয়। অনেক সৌখিন্ এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি নূতন ২ পক্ষী জঙ্গল হইতে ধরিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, এবং উহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত অকার্য্যও করিয়া থাকেন; ঐ সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি পক্ষীগণের বনবিষয়ক স্বতন্ত্রতা ভঙ্গ করতঃ, উহাদের কয়েদীর ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ রাখেন, এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞানে এই বুঝিয়া থাকেন যে, তাঁহারা পক্ষীদিগকে উত্তম আহার দিতেছেন এবং উহাদিগকে অন্যের ভয় হইতে রক্ষা করিতেছেন, এবং জীবদয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া ব্যাধ হইতে পক্ষীগণকে ক্রয় করিয়া উহাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের এবম্বিধ সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিজনক, কারণ যদি কেহ তাঁহাদিগকে আত্মীয় স্বজন হইতে পৃথক্ রাখিয়া বন্ধনদশাগ্রস্ত করে, এবং উত্তম উত্তম ভোজন সামগ্রীও খাইতে দেয়, ঐ অবস্থা কি তাহাদের মনোমত হয়? বাজারে পক্ষী বিক্রয় করিতে আসিলে, ঐ পক্ষী যদ্যপি কেহ ক্রয় না করে, তবে বিক্রয়ের নিমিত্ত কেহই পক্ষী আনিবে না, কারণ ঐ সকল পক্ষীর মাংস মাংসাহারী প্রায় ভক্ষণ করে না, যেহেতু উহার মাংস প্রচুর হয় না এবং ব্যয়ও অধিক লাগে।

এজন্য যে দেশে পক্ষীপালন ব্যবহার নাই, সেই দেশে নানা প্রকারের সহস্র সহস্র পক্ষী থাকিলেও বাজারে একটীও বিক্রয় হয় না, যেহেতু বিক্রেতা বিক্রয়লব্ধ অর্থ-অর্জনে বঞ্চিত হয়। গুজরাট্ প্রভৃতি দেশের অধমজাতি এবং অন্যান্য দেশ হইতে আগত সহস্র সহস্র সন্যাসী ও ফকীর পক্ষী-পালন করে, কিন্তু ঐ দেশের গৃহস্থগণ দয়ালু, এজন্য তাহারা জীব গণকে পশুশালায় ছাড়িয়া আসে।

কথাপ্রসঙ্গে এস্থলে আমার স্মরণ হইল যে যাবতীয় দেশে দেখা যায়, যাহার পুত্র বা কন্যা জন্মেনা সে নানা দেব দেবীর পূজা মানত্ করে, এবং মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্রাদিরও প্রয়োগ করে, তত্রাপি সে সন্তানলাভে বঞ্চিত থাকে। উহার কারণ প্রায় এইরূপই হয় যে, পূর্ব্বজন্মে ঐ ব্যক্তি অজ্ঞান দশায় কোন জীবের সন্তানকে উহার মাতা পিতা হইতে বিযুক্ত করিয়া থাকিবে, অথবা পক্ষীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়াছিল, তজ্জন্য পূর্ব্বজন্মে ঐ সন্তানকে দুঃখ দিবার কারণ, ইহ জন্মে সে অপুত্রক্ হইয়াছে। এইরূপে অনেকের পুত্র জন্মে না এবং যদিও জন্মে, সে পুত্র জীবিত থাকে না। অপুত্রক ব্যক্তি "সকলই সেবার অধীন" মনে করিয়া, সাধু, সন্যাসী, ফকীর প্রভৃতির উপাসনা করেন এবং প্রার্থণা করেন যে "মহারাজ! আমার একটী পুত্রের কামনা আছে, কি উপায়ে আমি পুত্র লাভ করিব, তাহা বলিয়া দিন্"। কিন্তু ঐ রূপ তত্ত্বজ্ঞানী-যোগী কিম্বা ফকীর প্রায় মিলে না, কেবল বাগাড়ম্বর অধিক দেখা যায়, তজ্জন্য লাভ অপেক্ষা বিশেষ হানি যাহাতে হয়, উহাঁরা সেইরূপ উপদেশ প্রায় দিয়া

থাকেন। ইহার এক দৃষ্ঠান্ত এস্থানে বর্ণিত হইতেছে। যথা—পিপীলিকাদের আহার করাইবার জন্য অনেকে গর্ত্তের নিকট আটা ও চিনি রাখিয়া দেয়, যাহাতে বহু সংখ্যা পিপীলিকা আসিয়া উহা খাইতে পারে; এবং ঐরূপ উপায় হইতে পুত্রোৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাও কেহ কেহ বিশ্বাস করে, কারণ ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ এবং কর্ম্মতত্ত্বে অবিশ্বাসী নানা দেশস্থ বহু-বিধ লোকে বিচারদ্বারা লাভালাভ বুঝিতে না পারিয়া ঐরূপ কার্য্য করে দেখা যায়; পরন্তু এস্থলে বিশেষ বিচারের কথা এই যে, যখন আটা ও চিনি দিলে বহুপরিমানে পিপীলিকা একত্র হয়, সেই সময় অন্য এক জীব আসিয়া ঐ আটা ও চিনি খাইতে থাকিলে, অনেক ক্ষুদ্র পিপীলিকা সংহারদশা প্রাপ্ত হয়। প্রায় দেখা যায় যে পক্ষী আসিয়া ঐ আটা খায় এবং অনেক পিপীলিকার প্রাণ সংহার করে। আরও এক কথা এই যে, পিপীলিকা সংমূর্চ্ছন জীব বলিয়া পিতা মাতা ব্যতিরেকেও উৎপন্ন হয়; অতএব আটা ও চিনি মিলিত হইলে, বায়ু সংযোগে যখন নূতন পিপীলিকা উৎপন্ন হয়, তখন উহাদেরও হিংসা করা হয়। এইজন্য এবম্বিধ কার্য্যে ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্ম স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। পরোপকার, শীলতা, সন্তোষ, দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য হইতেই পুত্রপ্রাপ্তির উপায় উদ্ভাসিত হয়, পরন্তু পাপমিশ্রিত পুণ্য কার্য্য হইতে কদাচ ফলোৎপত্তি হয় না। অতএব যাহাতে লাভ অপেক্ষা হানি বিশেষ আছে এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। তত্ত্ববেত্তাগণ পরোপকারকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কহিয়াছেন, পরোপকার জীবদয়ার পুত্র, কারণ মাতা ভিন্ন পুত্রোৎপত্তি

যেরূপ অসম্ভব, সেই রূপ দয়া ভিন্ন পরোপকার সম্ভবপর নহে। পরোপকার বিষয়ে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন—

"অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥"

অর্থাৎ—অষ্টাদশ পুরাণে অনেক কথা আছে তন্মধ্যে মুখ্য কথা দুইটী মাত্র; প্রথম "পরোপকার" যাহা দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়, এবং দ্বিতীয় "পরপীড়ন" যাহা দ্বারা পাপ সঞ্চয় হয়। পরপীড়ন হইতে অধর্ম্মই হইয়া থাকে, কিন্তু পরোপকার হইতে পুণ্য, তাহা হইতে স্বর্গ, ক্রমশঃ মোক্ষ লাভ হয়।

এক্ষণে লৌকিক-ব্যবহার-বিরোধী অনুভবসিদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা অহিংসার স্বরূপ যথাবৎ বর্ণিত হইতেছে। সকল দর্শনশাস্ত্রে হিংসাকে অধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, এবং দয়াকে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম মানিয়াছেন, এ বিষয়ে আস্তিক মাত্রেরই কোন বিবাদের কারণ নাই, তত্রাচ এস্থলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিলে ধার্ম্মিকগণের পক্ষে ঐ প্রমাণ বিশেষ দৃঢ় হইবে, এইজন্য হিন্দুদিগের পূজণীয় মনুস্মৃতি, মহাভারত এবং কূর্ম্মাদি পুরাণের দৃষ্টান্ত সময়ে সময়ে উল্লেখ করিয়া, অহিংসা বিষয়ক প্রবন্ধ নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা—প্রথমতঃ মনুস্মৃতি দেখুন—

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥"

নির্ণয় সাগর অঃ ৫ শ্লোঃ ৪৫ পৃঃ ১৮৭

অর্থাৎ—অহিংসক নিরপরাধী জীবকে যে ব্যক্তি আপনার সুখ ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে, সে জীবিত অবস্থায় মৃত-

প্রায় থাকে, কারণ তাহার কোথায়ও সুখ নাই।

পুনশ্চ লিখিয়াছেন—

"যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে" ॥ ৪৬ ॥

ভাবার্থ—প্রাণিগণকে হত্যা, বন্ধন আদি ক্লেশ দিতে যে ইচ্ছা না করে, সেই সকলের-হিতাকাঙ্ক্ষী-ব্যক্তি অতিশয় সুখভোগরূপ স্বর্গ অথবা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। আরও দেখুন—

"যদ্ ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন" ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য এই—যে ব্যক্তি দংশ মশকাদি ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ প্রাণিকে হিংসা না করে, সে অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হয়, এবং যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে, কিম্বা তাহার পুরুষার্থসিদ্ধ ধ্যানাদি বিষয়ে লক্ষ্য থাকিলে উহা অনায়াসলভ্য হয়, অর্থাৎ অহিংসারত প্রতাপী পুরুষ যে বিষয় মনে মনে কল্পনা করেন, তাঁহার সেই বিষয় শীঘ্র নিষ্পন্ন হয়। এবং ইহাও লিখিত হইয়াছে—

"নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ" ॥ ৪৮ ॥

ভাবার্থ এই—প্রাণিহিংসা ব্যতিরেকে মাংস পাওয়া যায় না, এবং প্রাণিহিংসা দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না, এইজন্য মাংস সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা উচিত।

এরূপও লিখিত হইয়াছে—

"সমুৎপত্তিং চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ" ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য এই—মাংসের উৎপত্তি এবং প্রাণিগণের হত্যা ও বন্ধন দেখিয়া, মনুষ্যের সর্ব্ববিধ মাংসভক্ষণে নিবৃত্ত থাকা উচিত। পূর্ব্বোক্ত মনুস্মৃতির পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৪ হইতে ৪৯ শ্লোকের রহস্য যে ব্যক্তি অবগত আছেন, তিনি কদাপি মাংস ভক্ষণ করিবেন না। কারণ সরল পথ ছাড়িয়া শঙ্কাকুল পথে যাইতে কেহই সাহস পাইবেন না। ৪৯ শ্লোকে মনুদেব সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন, ইহাতে বিধিপূর্ব্বক মাংস ভক্ষণে যাঁহারা দোষ মানেন না, তাঁহাদের পক্ষও দুর্ব্বল হইয়াছে, কারণ দেবতাগণের মাংসাহারে প্রবৃত্তি নাই; যদ্যপি শত মন পরিমান মাংস দেবতার অগ্রে রাখা যায়, তাহার এক টুক্‌রাও কমিয়া যায় না। যদি দশটী ছাগল দেবতার মন্দিরাভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া রাত্রিকালে ঐ মন্দিরের চতুর্দ্দিক রক্ষা করা যায়, এবং প্রাতঃকালে মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখা যায়, তবে একটীও ছাগল উহা হইতে কমিয়া যায় না; ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে লোভী মাংসাহারী মনুষ্য, অন্যান্য সাধুপ্রকৃতি সরলভাবাপন্ন মনুষ্যকে কুতর্কে মোহিত করিয়া, জীবহিংসায় প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়া ক্ষণমাত্র রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনজন্য, নিরীহ প্রাণি হিংসা করায়।

কোন কোন ভক্ত দেবীকে মানত্ করে যে "হে মাতা ঠাকুরাণি! আমার পুত্র অমুক রোগমুক্ত হইলে, আমি এক পাঁঠা আপনাকে বলিরূপে উপহার দিব"। যদি কর্ম্মযোগে সেই বালক আয়ুবলে আরোগ্য লাভ করে, তবে ঐ ভক্ত মনে করে যে মাতাঠাকুরাণী কৃপা করিয়া তাহার

পুত্রের জীবন দান করিলেন ; তখন সে আনন্দিত হইয়া নিরপরাধী ছাগলটিকে উত্তমরূপে সাজাইয়া দেবীর নিকট লইয়া যায়, এবং ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ দ্বারা ফুল চন্দন চড়াইয়া, ঐ পশুর স্বর্গপ্রাপ্তির মন্ত্র পড়াইয়া, নির্দয় রীতি অনুসারে ঐ ছাগলের প্রাণ বিনাশ করে। এখানে এক কবীর বাক্য আমার স্মরণ হইল যে—

"মাতা পাসে বেটা মাঙ্গে কর্ বক্‌রেকা সাঁটা।
অপ্‌না পূত খিলাওন্ চাহে পূত দুজে কা কাটা।
হো দিবানী দুনীয়া" ॥

দেখুন্—যে আপনার পুত্রের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া অপরের পুত্র হত্যা করে, তাহার অপেক্ষা স্বার্থপর জগতে কে আছে? এস্থলে বিবেচনা করা উচিত যে প্রথমতঃ মানত্‌রূপ কল্পনাই মিথ্যা, কারণ যদ্যপি মানত্ হইতে দেবী আয়ু বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই মরিত না ; যে ব্যক্তি মানত্ করে, তাহাকে শপথ-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে সে অবশ্য ইহাই বলিবে যে, "সকল মানত্ আমাদের সফল হয় না, সহস্র মানত্ করিলেও কতবার বিফল হইয়া যায় এবং পুত্রাদি মারা যায়"। অতএব মানত্ দুই প্রকারে বৃথাই হইতেছে, যেহেতু রোগীর যদ্যপি আয়ু থাকে তবে সে কখনই মরিবে না, তখন মানতের প্রয়োজন নাই, আর যদ্যপি আয়ু না থাকে তবে কখনই বাঁচিবে না, সুতরাং মানত্ নিষ্ফল হইল।

আরও বিচার করা আবশ্যক যে যদ্যপি পাঁঠার লোভে দেবী তোমার রোগ আরোগ্য করিয়া দেন, তবে তিনি তো

তোমার আজ্ঞাধীনা সেবিকা হইলেন, অথবা উৎকোচ গ্রহণ করিলেন ; যদ্যপি উৎকোচে তিনি সন্তুষ্টা হন্, তবে তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন এবং সন্তুষ্টা না হইলে মঙ্গল করিবেন না। উৎকোচ গ্রহণকারীর জগতে কিরূপ মর্য্যাদা তাহা পাঠকগণ স্বয়ং বিচার করুন্ !

মহোদয়গণ !—প্রথমতঃ মাতা শব্দের অর্থ বিচার করিলে এই হয় যে, যিনি সর্ব্বদা লালন পালন করেন তাঁহাকেই মাতা বলা যায়, পরন্তু যাঁহার নিকট ছাগল বলিদান দেওয়া হয়, তিনি জগদম্বা (জগতের মাতা) নামে কিরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন ? যিনি সমস্ত জীবের মাতা, তিনি বলির নিমিত্ত আনিত ঐ ছাগলেরও তো মাতা হইলেন ? এক্ষণে বিবেচনা করুণ যে, এক পুত্রকে ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় পুত্রের জীবন রক্ষা করা কতদূর সম্ভব, যেহেতু সকল পুত্রই মাতার নিকট সমান ! অজ্ঞানী স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ, জগদম্বার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া, জীবহিংসার নিমিত্ত উৎসাহ করে, এই সকল পাপানুষ্ঠান হেতু জীবগণ অধুনা মহামারী, বিসূচিকা, প্লেগ প্রভৃতি অশেষ কষ্ট সহ্য করিতেছে। অনীতির জন্য জগদম্বা জীবকে স্বহস্তে দণ্ড দ্বারা শাসন করেন না, পরন্তু পরোক্ষ রীতি অনুসারেই দণ্ডবিধান করেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে বিন্ধ্যাচলে ৺ভগবতীর মন্দিরে অনেক সংস্কৃত অভিজ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তি উপস্থিত হন—বিশেষতঃ নবরাত্রের সময় অনেকে মিলিত হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করেন, এবং তদ্গত চিত্তে ভগবতী দুর্গা

দেবীর ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করেন, পরন্তু ঐ স্থানে নিরীহ এবং অনাশ্রয় পাঁঠাদিগকে বলি দিতে দেখিয়া, ভক্তগণের চিত্ত অবশ্য ক্ষণকালের নিমিত্তও ক্ষুভিত হয়, এবং তাঁহারা মনে করেন যে এরূপ হিংসাজনক পূজার প্রচলন কোথা হইতে হইল ? যখন ভগবতী আপন পুত্রগণের হত্যাজন্য বিসূচিকা-আদি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মহামারীর সৃষ্টি করেন, তখন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মনুষ্যগণ পলায়ন করে, এবং কত শত লোক কালকবলে নিপতিত হয়। লোকে অনেক সময় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং স্বয়ংও অনুভব করিয়াছেন, তথাপী অনুসৃত মার্গ পরিত্যাগ করে না। পাঁঠা বলি দিলে মাতাকে ভক্তি করা হয় না। স্ব স্ব ইষ্ট দেবতা কালী, দুর্গা, গৌরী প্রভৃতি দেবীগণের পূজাতে উত্তম উত্তম সামগ্রী উৎসর্গ করা উচিত। কেহ কেহ দুর্গাপূজা উপলক্ষে পশু নিবেদন করিতে আগ্রহ করেন, তাঁহাদের বুঝা উচিৎ যে "পশু পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ" যে মন্ত্র আছে, উহার মর্ম্ম এই যে, পুষ্প যেরূপ সমগ্র দেবীকে নিবেদন করা হয়, পশুও সেই প্রকার সমগ্র নিবেদন করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যে "হে জগদম্বে ! আপনার দর্শনলাভ করিয়া আমরা যেরূপ নির্ভয়ে এবং আনন্দে দিনাতিপাত করি, ঐ পশুও আপনাকে দেখিয়া সেইরূপ নির্ভয় হউক এবং জগতে আনন্দে বিচরণ করুক্, এবং কোন মাংসাহারী হিংস্রকব্যক্তি যেন উহার গলদেশে অস্ত্রাঘাত না করে"। এবম্বিধ সংকল্প করিয়া ছাগলকে পরিত্যাগ করা উচিত, যাহাতে পুন্য অর্জ্জন হয়, মাতাও প্রসন্ন হন্ এবং জগদম্বার প্রকৃত অর্থও সিদ্ধ

হয়। ইহার অন্যথা হইলে জগদম্বার অর্থ "জগদ্ভক্ষিণী" হইয়া যাইবে।

মহানুভাবগণ! ৪৮ এবং ৪৯ শ্লোকে, প্রাণিবধ করিলে স্বর্গলাভ হয় না, মনুদেব ইহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। ঐ শ্লোক যদ্যপি কল্পিত অনুমান হয়, তবে মাংসাহার করিলে স্বর্গ হয় ইহাও কল্পিত কেন না হইবে? পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ৫৩—৫৪—৫৫ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতংসমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্" ॥ ৫৩॥

ভাবার্থ এই—যে ব্যক্তি প্রতি বৎসর এক একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া শত যজ্ঞ পূর্ণ করে, এবং যে ব্যক্তি কোন প্রকার মাংসভক্ষণ না করে, তাঁহাদের উভয়ের পুণ্যফল সমান হয়।

"ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈ মুন্যন্নানাং চ ভোজনৈঃ ॥
ন তংফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জনাৎ" ॥ ৫৪ ॥

অর্থাৎ—পবিত্র ফলমূলাদি তথা অন্নাদি ভোজন করিলে যে ফললাভ না হয়, কেবল মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে।

"মাং স ভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ" ॥ ৫৫ ॥

অর্থাৎ—যাহার মাংস আমি ইহজন্মে খাইতেছি জন্মান্তরে সে অবশ্যই আমার মাংস খাইবে। "মাংস" শব্দের অর্থ মহাত্মাগণ এই রূপই কহিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে বিবেচিত বিষয় এই যে—৫৩ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে "শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে সেই ফল হইয়া থাকে"। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বর্ত্তমান সময়ে বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া অতিশয় সুকঠিন, কারণ প্রথমতঃ সমগ্র পৃথিবী জয় করিলে তবে যজ্ঞের অধিকারী হইবে; এবং দ্বিতীয়তঃ লক্ষ লক্ষ অর্থব্যয় আবশ্যক। এরূপ করিলেও হিংসাজন্য পাপ যজ্ঞকারীকে অবশ্য অর্শা-ইবে। এ বিষয়ে "সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী"তে লিখিত হইয়াছে,- "স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ" অর্থাৎ পাপমিশ্রিত যজ্ঞে পুণ্য হয় সত্য, কিন্তু পাপ পরিহারজন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়; যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, তবে পুণ্যভোগের সময় মনুষ্যকে হিংসাজন্য পাপও অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। ইত্যাদি—। বৈদিকধর্ম্ম যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদের সহিত বেদাচারিগণের এই বিষয়ে যদিও মতের অনৈক্য হয়, কিন্তু মনুদেব মাংস ত্যাগ করিবার যে ফল দেখাইয়াছেন, উহা সকলের মতে নির্ব্বিবাদ এবং অনায়াসসাধ্য বলিয়া সকলেরই অনুমোদন যোগ্য। ৫৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, মুনিগণ আচার পালন করিলে যে পুণ্য লাভ করেন, কেবল মাংস বর্জ্জন দ্বারা সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে; অর্থাৎ শুষ্ক এবং জীর্ণ পত্রাদি আহারদ্বারা যে পুণ্য লাভ হয়, কেবল মাংস-ত্যাগে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এরূপ সরল, নির্দ্দোষ এবং নির্ব্বিবাদ মার্গ ছাড়িয়া, সদোষ, বিবাদাস্পদ ও অন্যের প্রাণবিঘাতী কার্য্যদ্বারা স্বর্গলাভেচ্ছু পুরুষের ৫৫শ্লোকের উপর অবশ্য দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। নিরুক্তিতে মাংস শব্দের

অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, "মাং" অর্থাৎ আমাকে যে খাইবে, "সঃ" অর্থাৎ সে ঐ হইবে যাহার মাংস আমি খাইতেছি ; মনুদেবও মাংস শব্দের অর্থ ঐরূপ কহিয়াছেন ; এক্ষণে মনুস্মৃতি মান্য করিয়া যাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্য করেন, তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে স্বর্গাদি পুণ্যলোক প্রাপ্তির অনেক রাস্তা আছে, তন্মধ্যে অনুকূল রাস্তায় সকল মনুষ্যের গমন করাই কর্ত্তব্য, প্রতিকূল রাস্তায় যাওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

পুরাণের মধ্যেও স্পষ্টরূপে হিংসা করিতে নিষেধ আছে। দেখুন্—ব্যাসদেব পুরাণে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"জ্ঞানপালীপরিক্ষিপ্তে ব্রহ্মচর্য্যদয়াঽম্ভসি।
স্নাত্বাঽতিবিমলে তীর্থে পাপপঙ্কাপহারিণি" ॥ ১ ॥
"ধ্যানাগ্নৌ জীবকুণ্ডস্থে দমমারুতদীপিতে।
অসৎকর্ম্মসমিৎক্ষেপৈ রগ্নিহোত্রং কুরূত্তমম্" ॥ ২ ॥
"কষায় পশুভির্দুষ্টৈর্ধর্ম্মকামার্থনাশকৈঃ।
শমমন্ত্রহতৈর্যজ্ঞং বিধেহি বিহিতং বুধৈঃ" ॥ ৩ ॥
"প্রাণিঘাতাত্তু যো ধর্ম্মমীহতে মূঢ়মানসঃ।
স বাঞ্ছতি সুধাবৃষ্টিং কৃষ্ণাঽহিমুখকোটরাৎ" ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ—জ্ঞানরূপ কুণ্ডস্থিত ব্রহ্মচর্য্য ও দয়ারূপ জল বিশিষ্ট এবং পাপরূপ পঙ্কাপহারক সুনির্ম্মল তীর্থে স্নান, ও জীবকুণ্ডস্থিত অগ্নিকে দমরূপ বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত করিয়া, অসৎকর্ম্মরূপ সমিধ তাহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তম অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের বিঘ্নকারী ক্রোধ, অভিমান, মমতা, লোভ প্রভৃতি কষায়রূপ দুষ্ট পশুগণকে, শমরূপ

মন্ত্রের দ্বারা বিনাশ করিয়া পণ্ডিতব্যক্তিদিগের আচরিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যে মূঢ়চেতা মনুষ্য পশুহত্যা হইতে ধর্ম্মলাভ ইচ্ছা করে, সে কালসর্পের মুখকোটর হইতে সুধাবৃষ্টি লাভ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে।

বিবেচনা—পূর্ব্বোক্ত চারিটি শ্লোক হইতে পাঠকগণ অবশ্যই অহিংসাময় যজ্ঞের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ প্রকার যজ্ঞে স্বর্গলাভ কি অপ্রাপ্য থাকে? যদ্যপি নির্দোষ পূর্বকথিত বিধি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহা হইলে বিবাদাস্পদ সদোষ বিধিতেও অধিক বিশ্বাসস্থাপন করা অকর্ত্তব্য, কারণ বৈদিকাচারিগণের মধ্যেও হিংসাজনিত-কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ে অনেক বিপরীত ভাবের উপলব্ধি হয়। দেখুন্—অর্চ্চিমার্গনুসারিগণ লিখিয়াছেন—যথা—

"দেবোপহারব্যাজেন যজ্ঞব্যাজেন যেহথবা।
ঘ্নন্তি জন্তূন্ গতঘৃণা ঘোরাং তে যান্তি দুর্গতিম্"॥ ১॥

ভাবার্থ—দেবপূজা কিম্বা যজ্ঞক্রিয়া নিমিত্ত যে নির্দয় ব্যক্তি প্রাণিগণকে হত্যা করে, সে ঘোর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। বেদান্ত বাক্যও শুনুন্—

"অন্ধে তমসি মজ্জামঃ পশুভির্যে যজামহে।
হিংসানাম ভবেদ্ ধর্ম্মো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"॥ ১॥

ভাবার্থ—"আমরা যে যজ্ঞ করিতেছি উহা অন্ধকার স্থানে নিমগ্ন হইতেছে, কারণ হিংসা দ্বারা কখনই ধর্ম্ম হয় নাই এবং হইবেও না"। এইরূপ বচন অনেকস্থলে দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি লাভালাভ-বিবেচনাক্ষম-লোভপরতন্ত্র মনুষ্য, প্রকৃত বস্তুর আদর করেন না এবং যুক্তির প্রতিও লক্ষ্য রাখেন্ না।

দেখুন্—ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত ৪র্থ শ্লোকে কহিয়াছেন যে "সর্প-মুখ হইতে যদি অমৃতবৃষ্টি সম্ভব হয়, তবে জীবহিংসা হইতে ধর্ম্মও সম্ভব হইতে পারে"। ব্যাসদেব এস্থলে যুক্তিযুক্ত বাক্যই বলিয়াছেন; সাধারণ লোকের এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যের আদর সকল লোকেই করিতে প্রস্তুত হয়, পরন্তু কবিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবের উক্তবাক্য কি গ্রহণযোগ্য নহে?

মনুদেব ৫৩-৫৪-৫৫ শ্লোকে যে অহিংসার মার্গ দেখাইয়াছেন, উহা সকল মনুষ্যের অনুমোদনযোগ্য, যেহেতু অহিংসা হইতেই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে; এ বিষয়ে জৈনাচার্য্যের বচনামৃত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"ক্রীড়াভূঃ সুকৃতস্য দুষ্কৃতরজঃসংহারবাত্যা ভবো—
দন্বন্নৌর্ব্যসনাগ্নিমেঘপটলী সঙ্কেতদূতীশ্রিয়াম্।
"নিঃশ্রেণিস্ত্রিদিবৌকসঃ প্রিয়সখী মুক্তেঃ কুগত্যর্গলা।
সত্ত্বেষু ক্রিয়তাং কৃপৈবভবতু ক্লেশৈরশেষৈঃ পরৈঃ" ॥ ১ ॥

ভাবার্থ—প্রাণিগণের প্রতি দয়াই করা কর্ত্তব্য, অন্য কোনরূপ কষ্টসাধ্য কার্য্যের প্রয়োজন নাই; যেহেতু অহিংসা সুকৃতের ক্রীড়াস্থান অর্থাৎ অহিংসা সুকৃত (পুণ্য)কে রক্ষা করে; অহিংসা দুষ্কৃত (পাপ) রূপ ধূলি নাশ করিবার জন্য বায়ু স্বরূপ, সংসার-রূপ-সমুদ্র পার হইবার তরণী স্বরূপ, ব্যসন-রূপ অগ্নিকে প্রশান্ত করিবার মেঘপটল স্বরূপ, লক্ষ্মীলাভের নিমিত্ত সঙ্কেতদূতী স্বরূপ, (অর্থাৎ দূতী যেরূপ সঙ্কেত দ্বারা স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পর সম্মিলন ঘটায়, অহিংসা হইতে পুরুষ ও লক্ষ্মীর সেইরূপ পরস্পর সম্মিলন হইয়া থাকে) স্বর্গের সোপান স্বরূপ, মুক্তিলাভের প্রিয়সখী এবং দুর্গতি

বিনাশের নিমিত্ত অর্গলা স্বরূপ।

বিবেচনা—অহিংসা হইতে সমস্ত অভীষ্ট বস্তু লাভ হইয়া থাকে, পরন্তু কাহারও এরূপ সংশয় হইতে পারে যে শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, পরোপকার, সন্তোষ, ধ্যান, তপস্যা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মপালনের উপদেশ আছে, সে সমস্তই তবে বৃথা হইবে? কারণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে দয়া করিবার জন্যই কেবল সূচনা করিয়াছেন, অন্যান্য ক্লেশসাধ্য কার্য্যের নিষেধ করিয়াছেন। উহার উত্তরে এইরূপ বুঝা কর্ত্তব্য যে, যাঁহার হৃদয়ে অহিংসাদেবীর প্রতিবিম্ব অল্প অথবা অধিক পরিমানে পড়িয়াছে, তাঁহার হৃদয়মন্দিরে ব্রহ্মচর্য্য, পরোপকার, সন্তোস, দান, ধ্যান, তপ, জপাদি সমস্ত গুণই আশ্রয় পাইয়াছে, তাহা না হইলে দয়াদেবী নিরুপদ্রবে কখনই থাকিতে পারেন না। দান, শীল, তপ, ভাবাদিরূপ কেয়ারি অহিংসারূপ সুন্দর উপবনে সুশোভিত হইয়াছে, এবং কারুণ্য, মৈত্রী, প্রমোদ ও মাধ্যস্থ এই চারি প্রকার ভাবনারূপ নালীদ্বারা শান্তিরূপ জল এদিক্ ওদিক্ প্রবাহিত হইতেছে। আর দীর্ঘায়ুষ্য, শ্রেষ্ঠশরীর, উত্তমগোত্র, পুষ্কলদ্রব্য, অত্যন্ত বল, ব্রাহ্মণ্য, আরোগ্য, অত্যুত্তম কীর্ত্তি প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীর কল্লোল হইতেছে এবং বিবেক, বিনয়, বিদ্যা, সংবিচারাদির সরল ও সুন্দর পত্রপংক্তি সকল প্রফুল্লিতভাবে বিস্তারিত আছে; পরোপকার, জ্ঞান, ধ্যান, তপ, জপাদিরূপ পুণ্যপুঞ্জ সাধুলোকের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে এবং স্বর্গ ও অপবর্গরূপ অবিনশ্বর ফলসকল ক্ষুধিত মুনিগণ আস্বাদন করিতেছেন; এবম্বিধ অহিংসারূপ অমূল্য উদ্যান রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যা

কথন পরিত্যাগ, অদত্তাদান পরিহার, ব্রহ্মচর্য্যসেবা, পরিগ্রহ-ত্যাগরূপ অটল, অভেদ্য, কামক্রোধাদি শত্রুগণের অনন্তকাল-জন্য-দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গের আবশ্যক। অতএব অহিংসারূপ অত্যুপ-যোগী উদ্যানকে ধার্ম্মিকগণ ন্যূনাধিক ধ্যান সন্ধ্যাদি ধর্ম্মকার্য্যরূপ দুর্গদ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন, একথা সর্ব্বথা গ্রাহ্য তাহার সংশয় নাই। যিনি একথা মানেন না, তাঁহাকে নাস্তিক বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। জীবহিংসার তুল্য অন্য কোন পাপ নাই এবং দয়ার সমান অন্য কোন ধর্ম্মও নাই। এই জন্য হিংসা করিলে কখনই ধর্ম্ম হয় না। দেখুন—

"যদি গ্রাবাতোয়ে তরতি তরণির্যদ্যুদয়তে
প্রতীচ্যাং সপ্তার্চ্চির্যদি ভজতি শৈত্যং কথমপি।
যদি ক্ষ্মাপীঠং স্যাদুপরি সকলস্যাপি জগতঃ
প্রসূতে সত্ত্বানাং তদপি ন বধঃ ক্বাপি সুকৃতম্" ॥১॥

ভাবার্থ—প্রস্তরের জলে ভাসা যদিও সম্ভব হয়, সূর্য্য দেবের পশ্চিম দিকে উদয় হওয়া যদিও সম্ভব হয়, সতীত্ব প্রভাবে সীতাদেবীর ন্যায় অগ্নির শৈত্যগুণ যদিও সম্ভব হয়, অথবা জগতস্থ প্রাণিগণের উপরিভাগে পৃথিবী উল্‌টাইবার যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু প্রাণিবধ হইতে পুণ্যসঞ্চয় কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এই সংস্কার দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে জৈনাচার্য্য লিখিতেছেন।—

"স কমল বনমগ্নের্বাসরং ভাস্বদস্তা
দমৃতমুরগবক্ত্রাৎ সাধুবাদং বিবাদাৎ।
রুগপগমমজীর্ণাজ্জীবিতং কালকূটা
দভিলষতি বধাৎ যঃ প্রাণিনাং ধর্ম্মমিচ্ছেৎ" ॥

ভাবার্থ—যে ব্যক্তি প্রাণিবধ হইতে ধর্ম্ম ইচ্ছা করে, সে দাবানল হইতে প্রস্ফুটিত পদ্ম, সূর্য্যাস্তের পর দিবস, সর্পের মুখ হইতে অমৃত, কলহ করিয়া প্রশংসা, অজীর্ণ থাকিতে রোগের উপশম এবং বিষ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে।

বিবেচনা—প্রস্তর জলে ভাসে না; যদ্যপি উহা কোন প্রকারে ভাসে, তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু প্রাণি বধ করিয়া পুণ্য অর্জ্জনের অভিলাষ করা নিশ্চয়ই বিস্ময়-জনক। ধূমমার্গানুসারিগণ কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা মাংস মন্ত্রযোগে শোধন করিয়া ভক্ষণ করেন, তজ্জন্য ভক্ষণে পাপ না হইয়া পুণ্য হয়। একথা বাস্তবিক সত্য নহে, কারণ বিবাহাদি কার্য্যও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়; পরন্তু যখন তাহাতে বিপরীত ফল দেখা যায়, তখন মাংসভক্ষণে বিপরীত ফল কেন না হইবে? মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হউক অথবা অসংস্কৃত হউক, জ্ঞানকৃত হউক বা অজ্ঞানকৃত হউক, জীবনের আশা করিয়া হউক অথবা মৃত্যুর ইচ্ছা করিয়া হউক, যে কোন অবস্থায় বিষভক্ষণ করিলে যেরূপ প্রাণবিয়োগই হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবহিংসাতেও সকল অবস্থায় পাপ আক্রমণ করে; সেই হিংসাজনিত দুষ্কৃত কখনই নষ্ট হয় না। দেখুন—বুদ্ধদেব লিখিয়াছেন—

"ইত একনবতে কল্পে শক্ত্যা মে পুরুষো হতঃ।
তেন কর্ম্মবিপাকেন পাদে বিদ্ধোঽস্মি ভিক্ষবঃ" ॥

অর্থাৎ—হে সাধুগণ! এই পৃথিবীতে একানব্বই কল্পে শক্তিদ্বারা আমি মনুষ্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলাম, সেইপাপে

আমার পদদ্বয় কণ্টকবিদ্ধ হইয়াছে। কর্ম্ম করিলে জন্মান্তরে অবশ্যই তাহার ফলভোগ হইবে; "যাদৃশং ক্রিয়তে কর্ম্ম তাদৃশং প্রাপ্যতে ফলম্" অর্থাৎ যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহার সেইরূপ ফল পাইবে। কর্ম্মফল হইতে কাহারও ভোগের নিস্কৃতি নাই, জীবহিংসা করিলে নিশ্চয়ই পাপের ভাগী হইয়া নরকভোগ করিতে হইবে। যথা—

"যাবন্তি পশুরোমাণি পশুগাত্রেষু ভারত।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি পচ্যন্তে পশুঘাতকাঃ॥"

ভাবার্থ—হে ভারত!' পশুর গাত্রে যত রোম আছে, পশুঘাতক তত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নরকে থাকিয়া নিজ দুষ্কৃতকর্ম্মফলে তাড়ন, তর্জ্জন, ছেদন ও ভেদনাদি নানা প্রকার অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অহিংসা সম্বন্ধে শাস্ত্রে এবম্বিধ সুস্পষ্ট উপদেশ থাকা সত্ত্বেও যাহারা হিংসা-বৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া মান্য করে, তাহারা সাত্ত্বিক মহানুভাব ব্যক্তিদিগকে অযথা উপদেশ দিয়া ভ্রমে পাতিত করে, এবং যে সকল ব্যক্তি অবিধিপূর্ব্বক জীবহত্যা করে, সেই হত্যা-কার্য্য নিয়মিত করিবার উদ্দেশে "বিধিপূর্ব্বক প্রাণিহিংসা করিলে স্বর্গলাভ হয়" ইত্যাদি প্রলোভনসূচক উপদেশ তাহাদিগকে দিয়া থাকে। এইরূপ কদর্য্য উপদেশের উত্তরে তাহাদের বুঝা উচিত যে, অবিধিপূর্ব্বক মাংসভক্ষক নিশ্চয়ই পশ্চাত্তাপ করে এবং নিজ আত্মাকেও নিন্দা করিয়া থাকে, যেহেতু আত্মা স্বভাবতঃ মাংসলিপ্সু নহে। আর বিধি পূর্ব্বক যাঁহারা মাংসাহার করেন, তাঁহারা পশ্চাত্তাপ করেন না, বরং ধর্ম্ম মনে করিয়া সুখী হন। পরন্তু মাংসের আস্বাদ

পাইয়া লোভ বশতঃ দেবীপূজার উপলক্ষ করতঃ সময়ে সময়ে তাঁহারা দেবীপূজার পরিবর্ত্তে নিজের উদর পূজা করেন, এবং যাঁহারা হিংসা হইতে নিবৃত্তির জন্য তাঁহাদের উপদেশ দেন, তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যোগ করেন। এস্থলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিচার করা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত "বিধি পূর্ব্বক হিংসার" উপদেশ হইতে শুভ অথবা অশুভ কিরূপ ফললাভ হইবে। এইরূপ অন্ধশ্রদ্ধা হইতে স্বর্গলাভেচ্ছা কেবল অনর্থের হেতু হইয়া থাকে, ইহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। মাংসেরা আক্ষেপ পূর্ব্বক মাংসভোজীকে উপদেশ দিয়াছেন—যথা—

"যূপং ছিত্ত্বা পশূন্ হত্ত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গং নরকে কেন গম্যতে" ॥

অর্থাৎ—যজ্ঞস্তম্ভ ছেদন করিয়া, পশুহত্যা করিয়া, রক্তের কর্দ্দম করিয়া যদ্যপি স্বর্গগমন হয়, তবে কোন্ কার্য্য দ্বারা নরকগমন হইবে? অর্থাৎ জীবহিংসার জন্য পাপ পৃথিবীতে আর নাই, হিংসাজনক ক্রূর কর্ম্ম করিলে যদ্যপি স্বর্গলাভ হয়, তবে হিংসা হইতে হীন অতিরিক্ত কোন্ কর্ম্ম আছে যাহাতে নরক হইবে? দেখুন্—তুলসীদাসের অহিংসা-পোষক বাক্যাবলি—যথা—

"দয়া ধর্ম্ম কো মূল হৈ পাপমূল অভিমান।
তুলসী দয়া ন ছোড়িয়ে জবলগ্ ঘটমে প্রাণ" ॥

ভাবার্থ—বৃক্ষ কদাচ মূলভিন্ন জীবিত থাকিতে পারে না এবং বৃক্ষ না থাকিলে ফলেরও আশা থাকে না; একথা সাধারণ লোকে যেমন অবশ্যই বোধগম্য করিতে পারেন,

সেইরূপ দয়াই যখন ধর্ম্মের মূল, তখন যেখানে হিংসা হইবে সেখানে দয়ার নামমাত্র থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আরও কথিত আছে যে—

"দয়া মহানদীতীরে সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তৃণাঙ্কুরাঃ।
তস্যাং শোষমুপেতায়াং কিয়ন্নন্দন্তি তে চিরম্" ॥

ভাবার্থ—দয়ারূপ মহানদীর তীরে সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যই তৃণাঙ্কুরের সমান, ঐ নদী শুষ্ক হইলে অঙ্কুরগণ কেমন করিয়া সজীব থাকিবে ?

বিবেচনা—নদীর তীরে বৃক্ষ, তৃণ, লতাদি সকলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জলের শীতল বায়ুস্পর্শে নবপল্লবিত থাকে, পরন্তু জলাভাবে যদ্যপি নদী শুষ্ক হয়, তবে সমগ্র বনস্পতি যেপ্রকার অবিলম্বে বিনাশপ্রাপ্তি হয়, সেই প্রকার দয়ারূপ নদীর অভাব হইলে ধর্ম্মরূপ অঙ্কুর স্থির থাকিতে পারেনা। নীতিশাস্ত্রকারগণও দয়ার প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। যথা—

"যথাচতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ।
তথৈব ধর্ম্মো বিদুষা পরীক্ষ্যতে শ্রুতেনশীলেনতপোদয়াগুণৈঃ"॥

অর্থাৎ—যেরূপ কোষ্টী পাথরে ঘসিয়া, কর্ত্তন করিয়া, অগ্নির উত্তাপ দিয়া এবং পিটিয়া এই চারিপ্রকার উপায় দ্বারা সুবর্ণ পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ বিদ্বান্‌ব্যক্তি শাস্ত্র, শীল, তপ এবং দয়াগুণ দ্বারা ধর্ম্মের পরীক্ষা করেন।

বিবেচনা—সুবর্ণ নশ্বর এবং অস্থায়ী পদার্থ হইলেও বুদ্ধিমান্ লোক পরীক্ষা না করিয়া উহা যখন ক্রয় করে না, তখন অবিনশ্বর, অচল এবং অনুপম-সুখোৎপাদক ধর্ম্মরত্নের যদ্যপি পরীক্ষা করা হয়, তবে উহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

যেরূপ সুবর্ণের পরীক্ষার নিমিত্ত নিঘর্ষণাদি পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে সেইরূপ ধর্ম্মরত্ন পরীক্ষার নিমিত্তও শ্রুত, শীল, তপ ও দয়া নিদর্শিত হইয়াছে। যে শাস্ত্রে অন্যেরবিরোধবাক্যের উল্লেখ নাই, পরন্তু যুক্তি সঙ্গত বাক্যেরই প্রয়োগ হইয়াছে এবং পরোপকার প্রভৃতি সদ্গুণের বর্ণনা আছে, সেই শাস্ত্রকেই প্রামাণিক গণনা করা উচিৎ। শীল অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অথবা সদাচার পালনের আবশ্যকতা যে ব্যক্তি হেতুর সহিত অবগত আছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মচারী বলা যায়, এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনের মূলকারণ জীবদয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বাৎসায়ন প্রণিত রতিশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে স্ত্রীযোনিতে অসংখ্য কীট উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য স্ত্রীগণের পুরুষসেবার নিমিত্ত উৎকট ইচ্ছা হয়, এবং জৈনশাস্ত্রকারেরাও স্ত্রীযোনিগত বীর্য্য ও রুধির মধ্যে অসংখ্য জীবের উৎপত্তি গণনা করেন, সেইজন্য একবার মৈথুন হইতে গর্ভস্থ নয়লক্ষ জীবের ধ্বংস হয়; তন্মধ্যে দ্বীন্দ্রিয়াদি জীবের সংখ্যা ২ লক্ষ হইতে ৯ লক্ষ পর্য্যন্ত হয়, এবং তৎসঙ্গে সংমূর্চ্ছিম জীবও অসংখ্য বিনষ্ট হয়। এ বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে যে, বংশনলী মধ্যস্থ তুলা, সন্তপ্ত-লৌহ-সলাকা দ্বারা যেরূপ অতি শীঘ্র ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ স্ত্রীপুরুষ সংযোগে যোনিস্থ অসংখ্য সংমূর্চ্ছিম জীব এবং এক হইতে নয়লক্ষ পর্য্যন্ত দ্বীন্দ্রিয়াদ জীব বিনষ্ট হয় ও গর্ভস্থ নয়লক্ষ জীব একবার মাত্র বিষয়সেবনে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এবং পুনরায় নূতন নূতন জীব উৎপন্ন হয়। ঐ সকল জীবের মধ্যে কর্ম্মযোগে যে একটী দুইটী বা তিনটী জীবিত থাকে, উহারাই বালকরূপে উৎপন্ন হয়। মদ্য, মধু,

মাংস এবং মাখন হইতেও তৎতৎ বর্ণের অসংখ্য জীব উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলির প্রামাণিকত্ব নিষ্পাদনহেতু প্রাকৃত গাথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"তহিঁ পঞ্চিন্দিয়া জীবা ইত্থীজোণী নিবাসিণো।
মণুআণং নবলক্খা সব্বে পাসেই কেবলী" ॥ ১ ॥
"ইত্থীণং জোণীসু হবন্তি বেইন্দিয়া য জে জীবা।
ইক্কো য দুন্নি তিন্নিবি লক্খপহুত্তং তু উক্কোসং"॥ ২ ॥
"পুরিসেণ সহ গয়াএ তেসিং জীবাণ হোই উদ্দবণং ॥
বেণুঅ দিট্ঠংতেণং তত্তাই সিলাগনাএণ"॥ ৩ ॥
"ইত্থীণ জোণিমজ্ঝে গব্ভগয়াইং হবন্তি জে জীবা।
উপ্পজ্জন্তি চয়ন্তি য সমুচ্ছিমা অসংখয়া ভণিয়া" ॥ ৪ ॥
"মেহুণসন্নারূঢো নবলক্খ হণেই সুহুমজীবাণং।
তিত্থয়রেণং ভণিয়ং সদ্দহিঅব্বং পয়ত্তেণং" ॥ ৫ ॥
"মজ্জে মহুম্মি মংসম্মি নবণীযম্মি চউত্থএ।
উপ্পজ্জন্তি অসংখা তব্বন্না তত্থ জন্তুণো" ॥ ৬ ॥

উপরোক্ত গাথাগুলির ভাবার্থ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

পাঠকগণ এক্ষণে অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে অহিংসাধর্ম্ম পালনের নিমিত্তই ব্রহ্মচর্য্য সাধিত হয়, তথাপি লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহার বিশেষ প্রমাণ আরও স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। দেখুন—কাহারও স্ত্রী অথবা সহোদরার প্রতি সদোষ দৃষ্টিপাত করিলে, উহার যে অসীম দুঃখ উপস্থিত হয়, উহার বিবেচনা অসম্ভব এবং এইরূপ দুঃখপ্রদান করাই

হিংসার স্বরূপ। অতএব ব্রহ্মচর্য্য পালন অহিংসার নিমিত্তই এবং ব্রহ্মচর্য্যকেই শীল অথবা সদাচার কহে। যে ধর্ম্মপালন করিলে কাহারও বাধা জন্মে না তাহাকেই সদাচার বলে, অতএব সদাচার সকলেরই উপকারক যেহেতুক উহাদ্বারা কাহারও অপকার সাধিত হয় না—

যথা—"লোকাপবাদভীরুত্বং দীনাভ্যুদ্ধরণাদরঃ।
কৃতজ্ঞতা সুদাক্ষিণ্যং সদাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" ॥

ভাবার্থ—প্রামাণিক লোকের অপবাদে ভীত হওয়া, দীন ব্যক্তির উদ্ধারণে যত্ন করা, কৃতজ্ঞতা এবং সুন্দর দাক্ষিণ্যকে সদাচার কহে। এইরূপ সুন্দর আচারকে শীল কহে, এবং যে আচরণের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয়, তাহাকে তপ কহে, অর্থাৎ "কষায়ের" শান্তি এবং সর্ব্বথা আহারের ত্যাগকেই "তপ" বলে।

যথা—"কষায়বিষয়াহারত্যাগো যত্রবিধীয়তে।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শেষং লঙ্ঘনকং বিদুঃ" ॥

অর্থাৎ—ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রাগ, দ্বেষাদি কষায় এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় যাহাতে ত্যাগ হয়, তাহাকেই "উপবাস" বলা উচিৎ; ইহার অতিরিক্ত তপস্যাকে তত্ত্ববেত্তাগণ "লঙ্ঘন" কহিয়া থাকেন। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দেখা যায় অনেক লোক দশমীর দিন যে পরিমানে আহার করেন, তাহার দ্বিগুণ পরিমান আহার একাদশীর দিন করিয়াও একাদশীর উপবাস সিদ্ধ করেন; এরূপ তপস্যা মন্দ নয়! যেরূপ তপস্যার দ্বারা কর্ম্মের নাশ হয়, তাহারই নাম "তপ"। কায়মনোবাক্যে কোনও প্রাণীর প্রতি অন্যায়াচরণ না করিয়া

সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করাকেই দয়া বলে; আপনার শরীরে স্ফোটকাদি কোনরূপ ব্যাধি হইলে যেরূপ যন্ত্রণা অনুভব হয়, এবং উহার প্রশমনের জন্য যেরূপ নানা প্রকার চেষ্টা করা হয়, অন্যের শরীরে ব্যাধি হইলে পণ্ডিতগণের সেইরূপ প্রযত্নের সহিত তাহার উপশমের চেষ্টা করা উচিৎ।

যথা—"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
মাতৃবৎ পরদারেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ" ॥
(যঃ পশ্যতি স পশ্যতি)

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মবৎ ব্যবহার করে, পরের দ্রব্য প্রস্তরবৎ জ্ঞান করে এবং পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখে, তিনিই পণ্ডিত অথবা তিনিই নেত্রবান্ দেখুন্—এই শ্লোক হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে সকল জীবে শান্তিপ্রদান করাই দয়া এইরূপ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র শীল, তপস্যা ও দয়া যাহাতে আছে তাহাকেই ধর্ম্মরত্ন বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ ধর্ম্ম নাই, আর যদি কিছু থাকে, তবে তাহাতে কেবল সরল প্রকৃতি জীবকে ভবঘোরে ভ্রমণ করায় মাত্র! এইজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-ক্ষম শাস্ত্ররত্ন "নীতিশাস্ত্র" ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতগণ নিরপেক্ষভাবে বিচার না করিয়া, বিশুদ্ধ এবং সুনির্ম্মল অহিংসাধর্ম্ম অনাদর করতঃ, কুতর্কের বশীভূত হইয়া হিংসা করিতে উদ্যোগ করেন। বাস্তবিক অহিংসাদি সামান্যধর্ম্ম সমগ্র দর্শনশাস্ত্রকারগণের অভিমত, তাহার সন্দেহ নাই।

যথা—"পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মচারিণাম্।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ত্যাগো মৈথুনবর্জ্জনম্" ॥

অর্থাৎ—অহিংসা, সত্য, অপহরণবৃত্তি ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং সর্ব্বথা পরিগ্রহ অর্থাৎ মূর্চ্ছার ত্যাগ এই পাঁচ প্রকার পবিত্র মহাব্রতের আদর দর্শনশাস্ত্রানুসারী সকল—মহা পুরুষেই বিশিষ্টরূপে করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী, স্নাতক, নীলপট, বেদান্তী, মীমাংসক, সাংখ্য বেত্তা, বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব, পাশুপং, কালামুখী, জঙ্গম, কাপালিক, শাম্ভব, ভাগবত, নগ্নব্রত, জটিল প্রভৃতি আধুনিক এবং প্রাচীন মতাবলম্বিগণ যম, নিয়ম, ব্রত, মহাব্রত ইত্যাদি আখ্যা দ্বারা ঐ সকল পঞ্চমহাব্রতের আদর করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি করিতেছেন। পুরাণশাস্ত্রে উহার নিম্নলিখিত প্রমাণ আছে—যথা—

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব প্রথমপাদে লিখিত আছে—

"সর্ব্বে বেদা ন তৎকুর্য্যুঃ সর্ব্বে যজ্ঞাশ্চ ভারত।
সর্ব্বে তীর্থাভিষেকাশ্চ যৎকুর্য্যাৎ প্রাণিনাং দয়া" ॥

ভাবার্থ—হে অর্জ্জুন! জীবদয়া হইতে যে ফললাভ হয়, চতুর্ব্বেদ, যাবতীয় যজ্ঞ এবং সমগ্র তীর্থস্নান হইতে সে ফললাভ কদাচ হয় না। এবং ইহাও লিখিত হইয়াছে—

"অহিংসালক্ষণো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মঃ প্রাণিনাং বধঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মার্থিভির্লোকৈঃ কর্ত্তব্যা প্রাণিনাং দয়া" ॥

অর্থাৎ—জীবদয়াই ধর্ম্ম এবং জীবহিংসাই অধর্ম্ম, অতএব ধার্ম্মিক ব্যক্তি সর্ব্বদা দয়া করিবে। বিষ্ঠাশ্রিত ক্রিমী হইতে স্বর্গাধিপতি দেবরাজ পর্য্যন্ত সকলেরই মৃত্যুভয় এবং জীবিতাশা সমান। এ বিষয়ে লিখিত আছে—

"অমেধ্যমধ্যে কীটস্য সুরেন্দ্রস্য সুরালয়ে।
সমানা জীবিতাকাঙ্ক্ষা তুল্যং মৃত্যুভয়ং দ্বয়োঃ" ॥

ইহার ভাবার্থ উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে জৈনশাস্ত্রপ্রমাণ দশবৈকালিকের যথার্থ বচন নিম্নে লিখিত হইতেছে—

"সব্বে জীবা বি ইচ্ছন্তি জীবিউঁ ন মরিজ্জউঁ।

তম্হা পাণিবহং ঘোরং নিগ্গন্থা বজ্জযন্তি ণং" ॥

ভাবার্থ—সকল প্রাণিই বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কেহই মরিতে ইচ্ছা করেনা, এইজন্য প্রাণিবধ ঘোর পাপরূপ বলিয়া সাধুগণ ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই বাক্য দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববেত্তাগণ কহেন যে—

"দীয়তে ম্রিয়মাণস্য কোটীর্জীবিত এব বা।

ধনকোটিং পরিত্যজ্য জীবো জীবিতুমিচ্ছতি" ॥

অর্থাৎ—মৃত্যুদশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে যদি কেহ কোটী স্বর্ণমুদ্রা দান করিতে ইচ্ছা করে, কিম্বা কেহ কেবল জীবনদান করিতে চাহে, তবে সেই ব্যক্তি সুবর্ণমুদ্রা লোভ ত্যাগ করিয়া জীবনেরই প্রার্থনা করে, যেহেতু স্বভাবতঃ জীবের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অন্য পদার্থ নাই। এই বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত আছে যে—

এক সময় কোন রাজসভায় কতকগুলি বুদ্ধিমান লোক পরস্পর বিচার দ্বারা ইহা নিশ্চয় করিলেন যে, প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ নাই। রাজা তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত ঐ লোক সকলকে ডাকাইলেন এবং চারি জনের হস্তে চারিটী তৈলপূর্ণ পাত্র দিয়া আদেশ করিলেন যে, তোমরা চারিজন এই তৈলাধার হস্তে করিয়া সহরের দুর্গ প্রদক্ষিণ করিয়া আইস, কিন্তু পাত্র হইতে যদ্যপি এক বিন্দুও

তৈল পতিত হয়, তবে প্রথম ব্যক্তির দশ সহস্র, দ্বিতীয় ব্যক্তির পঞ্চাশ সহস্র, তৃতীয় ব্যক্তির লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দণ্ড হইবে এবং চতুর্থ ব্যক্তির জীবন দণ্ড হইবে। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তে ঐ চারিজন অগত্যা তাহাই করিলেন, পরন্তু পাত্র তৈলে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া তৈল পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল; সুতরাং তাঁহারা ধীরে ধীরে অতিশয় সতর্কতার সহিত চলিতে থাকিলেও প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পাত্র হইতে কয়েক বিন্দু তৈল পড়িয়া গেল, অবশেষ তৃতীয় ব্যক্তির পাত্র হইতেও তৈল পড়িল, পরন্তু চতুর্থ ব্যক্তি যাহার জীবনদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তিনি প্রাণভয়ে কাতর হইয়া একাগ্রচিত্তে এরূপ সাবধানে পাত্রহস্তে চলিয়াছিলেন, যে তাহার পাত্র হইতে বিন্দুমাত্র তৈল ও পতিত হয় নাই, যেরূপ পূর্ণপাত্র তিনি রাজসমীপে পাইয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ পূর্ণপাত্র দুর্গ প্রদক্ষিণ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন। রাজা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে, অহো! জীবিতাশা হইতে দেবদুর্লভ কার্য্যও সাধিত হইতে পারে। অতএব যে জীবিতাশার বিনাশকারী সে নিশ্চয়ই মহাপাপী, তাহার সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে অভয়দাতাকে মহাদানী কহিয়াছেন যথা—

"মহতামপি দানানাং কালেন হীয়তে ফলম্।
ভীতাভয়প্রদানস্য ক্ষয় এব ন বিদ্যতে" ॥ ১ ॥

"কপিলানাং সহস্রাণি যো বিপ্রেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
একস্য জীবিতং দদ্যাৎ ন চ তুল্যং যুধিষ্ঠির" ॥ ২ ॥

"দত্তমিষ্টং তপস্তপ্তং তীর্থসেবা তথা শ্রুতম্।
সর্ব্বেহপ্যভয়দানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্" ॥ ৩ ॥

"নাতো ভূয়স্তপোধর্ম্মঃ কশ্চিদন্যোঽস্তি ভূতলে।
প্রাণিনাং ভয়ভীতানামভয়ং যৎ প্রদীয়তে" ॥ ৪ ॥
"বরমেকস্য সত্ত্বস্য দত্তাহ্যভয়দক্ষিণা।
নতু বিপ্রসহস্রেভ্যো গোসহস্রমলঙ্কৃতম্ ॥ ৫ ॥
"হেমধেনুধরাদীনাং দাতারঃ সুলভা ভুবি।
দুর্লভঃ পুরুষো লোকে যঃ প্রাণিষ্বভয়প্রদঃ" ॥ ৬ ॥
"যথা মে ন প্রিয়ো মৃত্যুঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তথা।
তস্মান্মৃত্যুভয়ান্নিত্যং ত্রাতব্যা প্রাণিনো বুধৈঃ" ॥ ৭ ॥
"একতঃ ক্রতবো সর্ব্বে সমগ্রবরদক্ষিণাঃ।
একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্" ॥ ৮ ॥
একতঃ কাঞ্চনো মেরুর্ব্বহুরত্না বসুন্ধরা।
একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্" ॥ ৯ ॥

ভাবার্থ—অতি মহৎ দানের ফল কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শরণাগত জীবকে অভয়দান করিলে তাহার ফল কোনকালে ক্ষয় হয় না, অর্থাৎ অভয়দানের মুক্তিপ্রদ ফললাভ হয়। ১

হে যুধিষ্ঠির! যদ্যপি সহস্র দুগ্ধবতীগাভী ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, আর যদি একটিমাত্র জীবকে অভয়দান করা যায়, তবে অভয়দানের ফলই অধিক হইয়া থাকে। ২

অভীষ্টবস্তু দান, তপস্যা, তীর্থসেবা এবং শাস্ত্রানুশীলন এ সকল হইতে যে পুণ্য লাভ হয়, অভয়দানে তদপেক্ষা যোল গুণ অধিক পুণ্য হয়। ৩

এই ভূমণ্ডলে ভয়ভীত প্রাণিকে অভয়দান করাপেক্ষা তপস্যাতে অধিক পুণ্য হয় না, অর্থাৎ অভয়দানে পুণ্য অধিক হয়। ৪

একটী জীবকে অভয়দানরূপ দক্ষিণা দেওয়া যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সহস্র ব্রাহ্মণকে সালঙ্কৃতা গাভীদান করা সেরূপ শ্রেষ্ঠ নহে। ৫

সুবর্ণ, ধেনু, ভূমি ইত্যাদির দাতা পৃথিবীতে অনেক আছেন, কিন্তু প্রাণিগণকে অভয়দান করিবার লোক অতি দুর্লভ। ৬

হে অর্জ্জুন! মৃত্যু যেরূপ আমার প্রিয় নহে, সেইরূপ জীবমাত্রেই মৃত্যুকে ভাল বাসেনা, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রাণিগণকে মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করিবে। ৭

ভূরিদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ একদিকে এবং অপরদিকে ভয়-ভীত প্রাণির জীবনরক্ষা, এতদুভয়ের ফল তুল্য। ৮

একদিকে সুবর্ণের সুমেরু এবং বহুরত্নবিশিষ্ঠ পৃথিবীর দান এবং অপর দিকে কেবল প্রাণির জীবনরক্ষা, এই উভয়ের ফল সমান হয়। ৯

বিবেচনা—পুরাণের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ করিয়াছেন যে উহাতে কেবল অভয়দানেরই প্রশংসা করিয়াছেন, জৈনশাস্ত্রে অভয়দানকে মোক্ষের হেতু বলিয়াছেন; তথাপি শাস্ত্রীয় মোহবশতঃ অনেকে অভয় দানের মহিমা বুঝিতে পারেন না। উহার প্রথম শ্লোকে অভয়দানকে সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; অভয়দান করিতে কোন দ্রব্যের অবশ্যক নাই, কেবল মানসিক দয়া-ভাব অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সকল প্রকার জীবকে যথাশক্তি রক্ষা করা এবং সকলের উপর ক্রূরতা পরিত্যাগ করা আবশ্যক, এবং নিজের সুখের জন্য অপর প্রাণির জীবন

নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। এই বিষয়ে লিখিত আছে যে—

"ন গোপ্রদানং ন মহীপ্রদানং নান্নপ্রদানং হি তথা প্রধানম্।
যথা বদন্তীহ বুধাঃ প্রধানং সর্ব্বপ্রদানেম্বভয়প্রদানম্" ॥

পঞ্চতন্ত্র পৃঃ৭৭ শ্লোঃ ২৯৮

অর্থাৎ—বিদ্বান্ ব্যক্তি গো দান, পৃথিবী দান, এবং অন্নাদিদান কে তত শ্রেষ্ঠ বলেন না, যত অভয় দানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। অনেক অজ্ঞানী ব্যক্তি কেবল স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া এবং বিচার না করিয়া মশা, মাছি, ডাঁস, ছারপোকা, পিপীলিকা, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের প্রাণসংহার করে, কেহ কেহ ঘোড়ার পুচ্ছ হইতে বালামুচির সহায়তায়, কেহ হাত দিয়া, কেহ বা গরম জল দিয়া ছারপোকা প্রভৃতি জীব সংহার করেন। কেহ নিবারণ করিলে তাহা গ্রাহ্য করে না, বরং আপনার দোষ ঢাকিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার অসঙ্গত বাক্যের উল্লেখ করে। তাহাদের বুঝা উচিৎ যে ক্ষুদ্র প্রাণী বিনাশ করিলেও যথেষ্ট পাপ সঞ্চয় হয়, এ বিষয়ের যাথার্থ প্রমাণ করিবার জন্য বারাহপুরাণের শ্লোক নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা—

"জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জ স্বেদজানি কদাচন।
যে ন হিংসন্তি ভূতানি শুদ্ধাত্মানো দয়াপরাঃ" ॥ ৮ ॥

১৩২ অঃ ৫৩২ পৃঃ।

ভাবার্থ—জরায়ুজ অর্থাৎ মনুষ্য, গো, মহিষ, গর্দ্দভ, প্রভৃতি, অণ্ডজ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পক্ষী, উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ তরুলতাদি বনষ্পতি এবং স্বেদজ অর্থাৎ ছারপোকা, মশা, মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি জীবকে যে ব্যক্তি হিংসা না করে,

সে শুদ্ধাত্মা এবং দয়াপরায়ণ সর্ব্বোত্তম হয়।

বিবেচনা—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে স্পষ্ট জানা গেল যে সকল জীবকে রক্ষা করা এবং কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ছারপোকা, মশা, মাছি এবং পিপীলিকা প্রভৃতি জীব প্রথমতঃ মনুষ্যের ঘর্ম্ম এবং পচা ও দুর্গন্ধিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ উহারা নিজ নিজ জাতীয় পূর্ব্বজের রক্ত হইতে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু যেখানে ঐ সকল জীব মরে, তথায় আবার দ্বিগুণ এমন্ কি চতুর্গুণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, এইজন্য উহাদের মারিলে লাভ না হইয়া বরং ক্ষতি অধিক হয়। কালপূর্ণ হইলে উহারা স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায় এই বিবেচনা করিয়া উহাদের বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ সকল জীবকে অভয়দান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই—ইহা পূর্ব্বশ্লোকে স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। যদি ঐ প্রকারের কোন জীব শরীরের উপর আসিয়া বসে, তাহাকে না মারিয়া বস্ত্র দ্বারা ধীরে ধীরে উঠাইয়া দেওয়া উচিত এবং ভূমিস্থ প্রাণিগণকে বাঁচাইবার জন্য যতদূর সম্ভব দেখিয়া পথচলা আবশ্যক। অহিংসাধর্ম্ম পালন করিতে অর্থের ব্যয় নাই, অথচ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব যদি কেহ কোন দ্রব্যের ব্যয় না করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে চাহেন, তবে অহিংসাধর্ম্মই তাঁহার পালন করা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ে দৈবী এবং আসুরী সম্পদ্বিভাগে দেখাইয়াছেন যে, দৈবীসম্পৎ মোক্ষমার্গের এবং আসুরীসম্পৎ কেবল দুর্গতির কারণ। এই দৈবীসম্পদে আবার অভয়দানকেই

মুখ্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে—যথা—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্" ॥১॥
"অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্" ॥২॥
"তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত" ॥৩॥

গীতা অঃ ১৬।

ভাবার্থ—অভয় অর্থাৎ ভয়াভাব ১, সত্ত্বসংশুদ্ধি চিত্ত-সংশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তপ্রসন্নতা ২ জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি-বিষয়ে শ্রদ্ধা ৩, দান অর্থাৎ নিজের ভোগ্য বস্তু হইতে অভ্যাগত ব্যক্তিকে যথোচিত প্রদান করা ৪, দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম ৫, যজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা (যজ্ঞের এইরূপ অর্থ ভগবদ্গীতায় ২৭ পৃঃ কর্ম্মযোগে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—"যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম" অর্থাৎ ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের স্বীকার হইতে—ইত্যাদি। অতএব এখানেও ঐরূপ অর্থ গ্রাহ্য হইতেছে। কারণ অন্যান্য যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা আছে, পরন্তু ইহাতে অভয়, অহিংসা এবং দয়া এই তিনটী পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। যদ্যপী এস্থলে হিংসাময় যজ্ঞের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে দৈবীসম্পদের ছাব্বিশ কারণ যাহা উল্লেখ আছে, সে সকলের পরস্পর বিরুদ্ধভাব ঘটিত, এইজন্য এখানে যজ্ঞের অর্থ ঈশ্বরপূজা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না) ৬, সাধ্যায় অর্থে তত্ত্ব বিদ্যার পাঠ ৭, তপ তিনপ্রকার, ইহা ৯৪ পৃঃ ১৭ অঃ লিখিতহইয়াছে—যথা—

"দেবদ্বিজগুরু প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে" ॥ ১৪ ॥

"অনুদ্বেগকরংবাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে" ॥ ১৫ ॥

"মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে" ॥ ১৬ ॥

ভাবার্থ—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং প্রাজ্ঞব্যক্তির পূজা, শৌচ,—অন্তঃকরণ শুদ্ধি, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা এই সকল শারীরিক তপস্যা। উদ্বেগশূন্য অর্থাৎ যে বাক্যে অন্যের ক্লেশ না হয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ করা এবং বেদাভ্যাস এই সকল বাচনিক তপস্যা; মনের প্রসন্নতা, ক্রূরতা পরিহার, মৌন থাকা, আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ চিত্তকে স্ববশে রাখা এবং মনোভাব শুদ্ধ রাখা, এই সকল মানসিক তপস্যা ৮, আর্জব-অর্থাৎ বক্রতা বা কুটিলভাব পরিহার করিয়া সরল হওয়া ৯, অহিংসা—অর্থাৎ পরপীড়নে নিবৃত্ত থাকা ১০, সত্যবাক্য প্রয়োগ করা ১১, অক্রোধ অর্থে দুর্বাক্য শুনিয়া ব্যাকুলচিত্ত না হওয়া ১২, ত্যাগ—অর্থে উদারতার সহিত দান করা ১৩, শান্তি—অর্থাৎ মানসিক সংশয় নিবৃত্ত রাখা ১৪, অপৈশুন্য—অর্থে পরোক্ষে অপরের দোষ না বলা ১৫, দয়া—অর্থে যাহারা চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কোনও এক সাধ্য সাধনে অক্ষম, এবম্বিধ দীনজীবের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন ১৬, অলোলুপত্ব অর্থাৎ বিষয়লালসা পরিহার ১৭, মৃদুতা—অর্থাৎ ক্রূরতা অথবা কঠোরতা বর্জ্জন করিয়া সরলতা অবলম্বন করা ১৮,

হ্রী—অর্থাৎ অকার্য্য করিয়া জনসমাজে লজ্জিত হওয়া ১৯ অচাপল্য—অর্থাৎ বৃথাকার্য্যে ব্যাকুল না হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করা ২০, তেজ—অর্থাৎ দুঃখের অবস্থা আসিলেও স্বাভাবিক ভাব হইতে বিচ্যুত না হওয়া অর্থাৎ গম্ভীর ভাব অবলম্বন করা ২১, ক্ষমা—অর্থাৎ সামর্থ সত্ত্বেও কাহারও নিকট পরিভব প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করা ২২, ধৃতি—অর্থাৎ দুঃখের উপর দুঃখ আসিলেও চিত্তের স্থিরতা রাখা ২৩, শৌচ—অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর পবিত্রতা ২৪, অদ্রোহ—অর্থাৎ কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণের ইচ্ছা না করা ২৫, নাতিমানতা—অর্থাৎ অহঙ্কার রাহিত্য ২৬।

দৈবীসম্পদ ভাবি কল্যাণযুক্ত পুরুষেরই হইয়া থাকে এবং নিরয়গামী অশুভাস্পদ জীবেরই দম্ভ, মদ, অহঙ্কার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অজ্ঞানতা নিবন্ধন আসুরী-সম্পদ হইয়া থাকে। দৈবীসম্পদ বিভাগে অভয়দানাদি যে ছাব্বিশ প্রকার গুণের বিষয় বর্ণিত আছে তাহাতে ইহা সিদ্ধ হইল যে, হিংসা হইতে কদাচ ধর্ম্ম হয় না। দেখুন—মনুস্মৃতি, বরাহ পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে হিংসা করিলে প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। অতএব ধার্ম্মিক মনুষ্যের হিংসা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ভাগী হওয়া কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং" কর্দ্দম অগ্রে পায়ে মাখিয়া পশ্চাৎ উহা ধৌত করাপেক্ষা কর্দ্দম না মাখাই প্রয়োজন। যদ্যপি ঐরূপ মহাজন বাক্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত্যের ভাগী হইবার অপেক্ষা থাকিবে না।

মনুস্মৃতি ১১ অধ্যায় ৪৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"অভোজ্যানাম্ভ ভুক্ত্বান্নং স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টমেব চ।
জগ্ধ্বা মাংসমভক্ষ্যঞ্চ সপ্তরাত্রং যবান্ পিবেৎ" ॥

অর্থাৎ—চণ্ডালাদি নীচজাতির অন্ন, স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্টান্ন এবং অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করিলে সপ্ত অহোরাত্র যবোদক পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

বিবেচনা—প্রায়শ্চিত্ত বিধানে মাংস আহার করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, এরূপ বিধান সত্ত্বেও লোকে মাংস আহার করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যাঁহারা বিধিবিহিত মাংস ভক্ষণে পাপ নাই বলেন, তাঁহাদের দেখা উচিৎ যে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধ ২৫ অধ্যায়ে রাজা প্রাচীন বর্হিষ দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন যে "আমার চিত্ত কেন স্থির হইতেছে না"। দেবর্ষি যোগবলে রাজার চিত্তের অবস্থা অবগত হইয়া তদুত্তরে কহিয়াছিলেন যে, আপনি প্রাণিহিংসা সাধক অনেক গুলি যজ্ঞ করিয়াছেন, সেইজন্য আপনার চিত্ত স্থির নাই। এই কথা বলিয়া দেবর্ষি যোগবলে রাজাকে সেই সকল মৃত পশু আকাশমার্গে দেখাইয়া কহিলেন যে, হে রাজন্! ঐ সকল পশু আপনি যজ্ঞে হত্যা করিয়াছেন; উহারা ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছে যে আপনার আয়ু কবে শেষ হইবে এবং কবে উহারা আপনার শরীর কর্ত্তন করিয়া আপনার নিষ্ঠুরতার পরিশোধ লইবে। দেখুন—শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে লিখিত আছে—

"ভোঃ ভোঃ প্রজাপতে রাজন্! পশূন্পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ" ॥৭॥
"এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।

সংপরেতময়ৈঃ কূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ" ॥৮॥

এই দুই শ্লোকের ভাবার্থ উপরে স্পষ্টরূপে ব্যক্তকরা হইয়াছে।

রাজা প্রাচীন বর্হিষ দেবর্ষির এই কথা শুনিয়া মহাভয়ে ভীত হইলেন, এবং তাঁহার চরণে পতিত হইয়া হিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া উদ্ধারের প্রার্থনা করিলেন। তখন নারদ ঋষি ঈশ্বরোপাসনাদি শুভ কার্য্যের উপদেশ দিয়া রাজাকে উদ্ধার করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা বর্ণিত আছে, আপনারা ৪র্থ স্কন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষাধিকার ২৭৩ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে—

"তস্য তেনানুভাবেন মৃগহিংসাত্মনস্তদা।
তপো মহৎ সমুচ্ছিন্নং তস্মাদ্ হিংসা ন যজ্ঞিয়া" ॥৮॥ *

"অহিংসা সকলো ধর্ম্মোঽহিংসাধর্ম্মস্তথাহিতঃ।
সত্যং তেঽহং প্রবক্ষ্যামি নো ধর্ম্মঃ সত্যবাদিনাম্"॥২০॥

ভাবার্থ—কোন মুনি স্বর্গকামনা করিয়া মৃগ বধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার আজীবন তপস্যার ফল নষ্ট হইয়া গেল, এই জন্য হিংসাময় যজ্ঞ শুভজনক নহে। বস্তুতঃ অহিংসা দ্বারা সকল ধর্ম্মই সাধিত হয়, এবং অহিংসা ধর্ম্মই যথার্থ হিতকর ইহা সত্য কহিতেছি। যাঁহারা সত্যবাদী তাঁহাদের হিংসা করা কখনই ধর্ম্ম নহে।

বিবেচনা—পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, কোন মুনির সম্মুখে ধর্ম্ম মৃগরূপ ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলে, ঐ মুনি স্বর্গকামনায় সেই ধর্ম্মরূপী মৃগকে হত্যা

করিলেন ; তাহাতে তাঁহার সমস্ত তপস্যার ফল নষ্ট হইয়া গেল। এক্ষণে বিবেচনা করুণ যে তপঃ পরায়ণ মুনির যখন হিংসার জন্য তপস্যার ফল নষ্ট হইল, তখন যাঁহাদের তপস্যার লেশ মাত্র নাই, কেবল সাংসারিক সুখে রত থাকিয়া যাঁহারা লম্পট যজ্ঞের নিমিত্ত হিংসা করেন, তাঁহাদের গতি কি হইবে ? দেখুন্—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষাধিকার ২৬৫ অধ্যায়ে হিংসাময় যজ্ঞ করিতে স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছেন—যথা—

"ছিন্নস্থূনং বৃষং দৃষ্ট্বা বিলাপঞ্চ গবাং ভৃশম্।
গোগ্রহে যজ্ঞবাটস্য প্রেক্ষমাণঃ স পার্থিবঃ" ॥২॥

"স্বস্তি গোভ্যঽস্তু লোকেষু ততো নির্ব্বচনং কৃতম্।
হিংসায়াং হি প্রবৃত্তায়ামাশীরেষাস্তু কল্পিতা" ॥৩॥

"অব্যবস্থিতমর্য্যাদৈ র্বিমূঢ়ৈর্নাস্তিকৈনরৈঃ।
সংশয়াত্মভিরব্যক্তৈর্হিংসা সমনুবর্ত্তিতা" ॥৪॥

"সর্ব্বকর্ম্মস্বহিংসা হি ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ।
কামকারাদ্ বিহিংসন্তি বহির্বেদ্যান্ পশূন্নরঃ" ॥৫॥

"তস্মাৎ প্রমাণতঃ কার্য্যো ধর্ম্ম সূক্ষ্মো বিজানতা।
অহিংসা সর্ব্বভূতেভ্যো ধর্ম্মেভ্যো জ্যায়সী মতা" ॥৬॥

ভাবার্থ—রাজা বিচখ্যু যজ্ঞভূমিতে বৃষগণের ছিন্ন শরীর দর্শন করিয়া এবং গোগণকে বিলাপ করিতে শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং লোক মধ্যে গোগণের "স্বস্তি হউক" এই বাক্যটিকে নিশ্চয় করিলেন। হিংসা আরম্ভ হইলে তিনি এই আশীর্ব্বচন কল্পনা করিয়াছিলেন যে যাহাদের মর্য্যাদা বিচলিত হইয়াছে, তাদৃশ বিমূঢ় সংশয়চিত্ত নাস্তিক ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি হইতে খ্যাতি লাভের অভিলাষ

করিয়া পশু হিংসার প্রশংসা করিয়াছে; পরন্তু বেদার্থ তত্ত্ববিৎ ধর্ম্মাত্মা মনুদেব সকল কার্য্যে অহিংসারই প্রশংসা করিয়াছেন। স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যগণ তুচ্ছ কামনা পরিপূর্ণা-ভিলাষেও জীব হিংসা করিয়া থাকে। অতএব প্রমাণ দ্বারা সূক্ষ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। সর্ব্বভূতের প্রতি হিংসা না করাই সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই তত্ত্ববেত্তাগণ কহিয়া থাকেন।

বিবেচনা—রাজা বিচখ্যু ক্ষত্রিয় হইয়াও হিংসা দেখিয়া অধর্ম্ম ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, পরন্তু বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ-দিগের ভয়ের লেশ মাত্র নাই, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? অনেকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত হিংসা করিয়া গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলিয়া থাকেন যে হিংসাতে প্রবৃত্তি না থাকিলে যুদ্ধাদি বিষয়ে বিজয় লাভের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু তাঁহাদের ঐরূপ কল্পনার কোন ভিত্তি নাই, কারণ রাজা বিচখ্যু এবং প্রাচীন বর্হিষ হিংসা হইতে নিবৃত্ত ছিলেন; তাঁহারা হিংসা কার্য্যকে নিন্দাও করিয়াছেন, তজ্জন্য কি তাঁহাদের রাজ্য শাসনের কোন ব্যাঘাৎ ঘটিয়াছিল? তাঁহারা কি যুদ্ধ করিতে অক্ষম ছিলেন, অথবা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন? আর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধ এবং যজ্ঞাদি কার্য্যে যথেষ্ট পরিমাণে মাংসাহার করিয়া কি অধিক প্রতাপী হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন? আমি বলিতে পারি যে ঐ সকল ব্রাহ্মণ কেবল উদরপূর্ত্তি করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা কোন ধর্ম্মকার্য্যই সাধিত হয় নাই। রাজা বিচখ্যু যজ্ঞবাটে ব্রাহ্মণগণকে হিংসার জন্য উদ্যত দেখিয়া

যেরূপ আশীর্ব্বচন কল্পনা করিয়াছিলেন, উহা উপরোক্ত চতুর্থ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার অর্থ যথাসাধ্য বিস্তার করণাভিলাষে আমি প্রযত্ন করিতেছি—

হিংসা হইতে নিবৃত্তি-রূপ কার্যকে মর্য্যাদা কহে। যিনি সেই প্রকার মর্য্যাদা স্থির রাখিতে পারেন না, তাহাকে "অব্যবস্থিত মর্য্যাদ" কহে। অজ্ঞতাই উহার কারণ। এজন্য দ্বিতীয় বিশেষণ "বিমূঢ়ৈঃ" লিখিত হইয়াছে, ইহাও বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হয় নাই, তজ্জন্য পুণশ্চ "নাস্তিকৈঃ" পদও ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহার ধর্ম্মকার্য্যে আশক্তি নাই, তাহাকেই নাস্তিক বলা যায়। "সংশয়াত্মভিঃ" অর্থে যে পুরুষ আত্মা এবং দেহকে কখন ভিন্ন এবং কখন বা অভিন্ন ভাবেন। তিনি মনে করেন যে, আত্মা দেহ হইতে যদি ভিন্ন হন, তবে তিনি কর্ত্তা অথবা অকর্ত্তা, এবং কর্ত্তা হইলে এক বা অনেক, আর যদি এক হন, তবে তিনি সঙ্গবান্ অথবা নিঃসঙ্গ ইত্যাদিরূপ সংশয় সেই পুরুষের উপলব্ধি হয়। "অব্যক্তৈঃ" বিশেষণ পদের তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞাদি কার্য্যে হিংসাবৃত্তি হইতে যে ব্যক্তি খ্যাতিলাভ ইচ্ছা করেন। শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও লোকে হিংসা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহা কি সামান্য বিস্ময়ের কথা? অথবা ইহাই অনুভব হয় যে ঐ সকল ব্যক্তি মহামোহপাশে আবদ্ধ আছে, তজ্জন্যই তাহাদের প্রবৃত্তি হিংসাত্মক হইয়াছে। এক্ষণে ইহা সিদ্ধ হইল যে যজ্ঞের উদ্দেশেও মাংসভক্ষণ কদাচ উচিত নহে।

এই বিষয়ে মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৬৫ অধ্যায়ে লিখিত

হইয়াছে—

"যদি যজ্ঞাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ যূপাংশ্চোদ্দিশ্য মানবাঃ।
বৃথামাংসং ন খাদন্তি নৈষ ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে" ॥৮॥

ভাবার্থ—যজ্ঞপরায়ণ মনুষ্যগণ যদি যজ্ঞ বৃক্ষ যূপ সমুদয়কে উদ্দেশ করিয়া বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন, তবে তাহা প্রশংসনীয় ধর্ম্ম নহে; তাঁহারা কদাচ বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন না—অর্থাৎ বিধিবিহিত মাংস ভক্ষণ করাও উচিত নহে। ঐ অধ্যায়ে পুনশ্চ হিংসা করিতে নিষেধ করিয়া লিখিত হইয়াছে; যথা—

"সুরাং মৎস্যান্ মধুমাংসমাসবং কৃসরৌদনম্।
ধূর্ত্তৈঃ প্রবর্ত্তিতং হ্যেতদ্ নৈতদ্ বেদেষু কল্পিতম্" ॥৯॥

ভাবার্থ—সুরা, মৎস, মধু, মাংস, আসব ও তিল মিশ্রিত তণ্ডুল ভক্ষণ, ধূর্ত্তগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা কিছু বেদমধ্যে কল্পিত হয় নাই।

বিবেচনা—দেবর্ষি ব্যাসদেব স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বেদে হিংসার বিধি নাই আর যদি থাকে তবে ধূর্ত্তগণ তাহার অথকে অনর্থ করিয়াছে; উপরোক্ত ৯ম শ্লোকে এ বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে, তথাচ হিংস্রকলোকে সর্ব্বত্রেই কি জন্য বলিদানের মহিমা করিয়া থাকে? কেবল যে যজ্ঞে পশু বধ হইয়া থাকে তাহা নহে, পরন্তু যজ্ঞস্তম্ভের জন্য যে বৃক্ষের প্রয়োজন সেই বৃক্ষের প্রসাদনের নিমিত্তও বলিদান হয় এবং যাজক সেই পশুর মাংস ভক্ষণ করেন; পুনরায় যূপকাষ্ঠ যজ্ঞমণ্ডপে স্থাপন হইবার সময় বলিদান হয়। যজ্ঞাশ্রিত বৃক্ষ এবং যজ্ঞস্তম্ভের উদ্দেশে যে হিংসা কার্য্য

সাধিত হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত ৮ম শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ কার্য্যে পশুহিংসা ব্যাসদেবের স্বীকার্য্য নহে, বরং অনেক স্থলে তিনি ইহা নিষেধ করিয়াছেন।

পশু বলি দিয়া যে দেবতার পূজা করা হয়, তাঁহার ভজন (পূজন) সুরাপানের তুল্য পাপের হেতু হয়। এই বিষয় আনন্দাশ্রম সিরিজে মুদ্রিত পদ্মপুরাণ ২৮০ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। যথা—

"যক্ষাণাং চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসান্তু ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্" ॥ ৯৫ ॥

ভাবার্থ—যক্ষ, পিশাচ এবং মদ্যমাংসপ্রিয় দেবতাগণের পূজা সুরাপানের তুল্য অর্থাৎ সুরাপানে যে পাপ হয়, ঐ সকল দেবতার পূজাতেও সেই পাপ হইয়া থাকে। তত্রাপি যাঁহারা শ্রাদ্ধে মাংস ভক্ষণ করিতে আগ্রহ করেন, তাঁহারা বোধ হয় সাধারণতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায় দেখেন নাই, যদি দেখিতেন তাহা হইলে মাংস খাইতে কখনই আগ্রহ করিতেন না। দেখুন্—উহার ৭ম এবং একাদশ শ্লোকে লিখিত আছে যে—

"ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ।
মুন্যন্নৈঃস্যাৎ পরাপ্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া" ॥৭॥

"তস্মাদ্দৈবোপপন্নেন মুন্যন্নেনাপি ধর্ম্মবিৎ।
সন্তুষ্টোঽহরহঃ কুর্য্যান্নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ" ॥১১॥

ভাবার্থ—ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের উদ্দেশে কখনই মাংস প্রদান করেন না, এবং স্বয়ংও ভক্ষণ করেন না কারণ তাঁহারা জানেন যে মুনিগণসেবিত শুদ্ধঅন্নাদির দ্বারা

পিতৃগণের যেরূপ তৃপ্তি হয়, পশুহিংসালব্ধ মাংস দ্বারা তাঁহাদের সেরূপ তৃপ্তি হয় না। উক্ত অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, যজ্ঞকারীকে দেখিয়া পশু ভয় বিহ্বলচিত্তে ইহাই অনুমান করে যে "এই অজ্ঞানী ঘাতক নিজ শরীর পোষণের নিমিত্ত আমাদের প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছে"। এই উদ্দেশেই ১১ শ শ্লোকে "তস্মাৎ" পদের প্রয়োগ হইয়াছে; অতএব ধার্ম্মিকব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে নিরন্তর দেবতাদিগের গ্রাহ্য অন্নাদি দ্বারা নৈমিত্তিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন, হিংসার্জ্জিত উপাদান কদাচ প্রয়োগ করিবেন না। যদি কেহ পূর্ব্বকথিত বাক্য অনাদর করিয়া এইরূপ কহে যে, জীবহিংসা দ্বারা যজ্ঞ করা এবং শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন এবং বলিদান কেবল সত্য যুগেই নিষেধ আছে; পরন্তু কলিযুগে যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে মাংস খাইতেই ব্যবস্থা আছে। তাহার উত্তরে আমি এই বলি যে, সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এবং পরাশর স্মৃতিতে কলিযুগে অকরণীয় অনেক বিষয় বর্ণিত আছে, তৎপ্রতিপাদক শ্লোক নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা—

"অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সংন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ" ॥১॥

এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ ১২শ অধ্যায়ে লিখিত আছে। যথা—

"দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
"মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ" ॥ ১ ॥

ভাবার্থ—অশ্বমেধ এবং গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস গ্রহণ, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন এবং দেবর হইতে পুত্রোৎপাদন, এই

পাঁচ প্রকার কার্য্য কলিযুগে নিষেধ আছে। নারদীয় পুরাণেও উল্লেখ আছে যে দেবর হইতে সন্তানোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসদান এবং বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন কলিযুগে অকর্ত্তব্য।

পুনশ্চ বৃহৎপরাশর সংহিতা ৫ম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যথা—

"যস্তু প্রাণিবধং কৃত্বা মাংসেন তর্পয়েৎ পিতৃন্।
সোঽবিদ্বান্ চন্দনং দগ্ধ্বা কুর্য্যাদঙ্গারবিক্রয়ম্ ॥ ১ ॥
"ক্ষিপ্ত্বা কূপে তথা কিঞ্চিৎ বাল আদাতুমিচ্ছতি।
পতত্যজ্ঞানতঃ সোঽপি মাংসেন শ্রাদ্ধকৃৎতথা" ॥২॥

ভাবার্থ—যে ব্যক্তি প্রাণিবধ করিয়া মাংসদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতে ইচ্ছা করে, সেই অজ্ঞানী ব্যক্তি চন্দনকাষ্ঠ জ্বালাইয়া কয়লা বিক্রয় করিতে অভিলাষ করে। এবং কোন পদার্থ কূপে নিক্ষিপ্ত হইলে অজ্ঞতা প্রযুক্ত বালক যেরূপ উহা লইবার আশা করিয়া স্বয়ং কূপমধ্যে পতিত হয়, মাংসদ্বারা যাহারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করিতে অভিলাষ করে, তাহাদেরও ঐ বালকের ন্যায় দুর্গতি হইয়া থাকে।

যজ্ঞে পশুহিংসা করিলে ধর্ম্ম নষ্ট নয়, এই বিষয় সূচনা করিয়া মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব ৯১ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—যথা—

"আলম্ভসময়েতস্মিন্ গৃহীতেষু পশুষ্বথ।
মহর্ষয়ো মহারাজ! বভূবুঃ কৃপয়ান্বিতাঃ" ॥ ১১ ॥
"ততো দীনান্ পশূন্ দৃষ্ট্বা ঋষয়স্তে তপোধনাঃ।

ঊচুঃ শক্রং সমাগম্য নায়ং যজ্ঞবিধিঃ শুভঃ" ॥ ১২ ॥

"অপরিজ্ঞানমেতত্তে মহান্তং ধর্ম্মমিচ্ছতঃ।

নহি যজ্ঞে পশুগণা বিধিদৃষ্টাঃ পুরন্দর" ॥ ১৩ ॥

"ধর্ম্মোপঘাতকস্ত্বেষ সমারম্ভস্তব প্রভো।

নায়ং ধর্ম্মকৃতোযজ্ঞো ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে" ॥ ১৪ ॥

"বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মস্তেসুমহান্ ভবেৎ।

যজ্ঞবীজৈঃ সহস্রাক্ষ! ত্রিবর্ষপরমোষিতৈঃ" ॥ ১৫ ॥

ভাবার্থ—হে মহারাজ! যজ্ঞমণ্ডপে অধ্বর্যু লোক সকল কর্ত্তৃক পশুগণ বধনিমিত্ত গৃহীত হইলে, আলম্ভন সময়ে তপোধন ঋষিগণ পশুসকলকে দীন ভাবাপন্ন দেখিয়া কৃপা-পরবশ হইলেন, এবং শক্র সমীপে গমন করিয়া বলিলেন যে, এই যজ্ঞবিধি শুভ হয় নাই। হে পুরন্দর! আপনি মহান্ ধর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু আপনি ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হন্ নাই যে পশুগণ যজ্ঞে বিধিদৃষ্ট নহে। হে প্রভো! যখন হিংসা ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় নাই, তখন এই যজ্ঞ ধর্ম্মকৃত হইতেছে না; অতএব আপনার এই সমারম্ভ ধর্ম্মোপঘাতক হইতেছে। হে সহস্রাক্ষ! আপনি হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবর্ষোষিত বীজদ্বারা যজ্ঞ করুন, সেই বিধিদৃষ্ট যজ্ঞদ্বারা আপনার সুমহান্ ধর্ম্ম হইবে।

বিবেচনা—উপরোক্ত শ্লোকের পরেই ঐ অধ্যায়ে যে সকল শ্লোক মহাভারতে লিখিত আছে, উহা যজ্ঞবিষয়ে ঋষিগণ ও দেবতাদিগের মধ্যে বাদানুবাদ পরিপূর্ণ এবং ঐ সম্পূর্ণ অধ্যায়ের নাম "হিংসামিশ্রিত ধর্ম্মনিন্দা"। অবশেষে উপরিচর রাজা বসুকে, দেবতাদিগের পক্ষ লইয়া প্রকৃত অর্থ কে

অনর্থ করিবার নিমিত্ত যে নরকগামী হইতে হইয়াছিল, একথা অবশ্য সকলেই বিদিত আছেন। এই বিষয়ের নিদর্শন মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষাধিকার ৩৩৫ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। যথা—

যুধিষ্ঠির উবাচ—

"যদা ভাগবতোঽত্যর্থমাসীদ্ রাজামহান্ বসুঃ।
কিমর্থং স পরিভ্রষ্টো বিবেশ বিবরং ভুবঃ?" ॥ ১ ॥

ভীষ্ম উবাচ—

"অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ঋষীণাঞ্চৈব সংবাদং ত্রিদশানাঞ্চ ভারত" ॥ ২ ॥
"অজেন যষ্টব্যমিতি প্রাহুর্দেবা দ্বিজোত্তমান্।
স চ ছাগোঽপ্যজো জ্ঞেয়ো নান্যঃ পশুরিতিস্থিতিঃ" ॥৩॥

ঋষয় ঊচুঃ—

"বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকীশ্রুতিঃ।
অজসংজ্ঞানি বীজানিছাগং নো হন্তুমর্হথ" ॥ ৪ ॥
"নৈষ ধর্ম্মঃ সতাং দেবাঃ যত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ।
ইদং কৃতযুগং শ্রেষ্ঠং কথং বধ্যেত বৈ পশুঃ?" ॥৫॥

ভীষ্ম উবাচ—

"তেষাং সংবদতামেবমৃষীণাং বিবুধৈঃ সহ।
মার্গাগতো নৃপশ্রেষ্ঠস্তং দেশং প্রাপ্তবান্ বসুঃ" ॥ ৬ ॥
"অন্তরীক্ষচরঃ শ্রীমান্ সমগ্রবলবাহনঃ।
তং দৃষ্ট্বা সহসায়ান্তং বসুন্তে ত্বন্তরিক্ষগম্" ॥ ৭ ॥
"ঊচুর্দ্বিজাতয়ো দেবানেষ চ্ছেৎস্যতি সংশয়ম্।
যজ্বা দানপতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বভূতহিতপ্রিয়ঃ" ॥ ৮ ॥

"কথংস্বিদন্যথা ব্রূয়াদেষ বাক্যং মহান্ বসুঃ ?।
এবং তে সংবিদং কৃত্বা বিবুধা ঋষয়স্তথা" ॥ ৯ ।
"অপৃচ্ছন্ সহিতহভ্যেত্য বসুং রাজানমন্তিকাৎ।
ভোঃ রাজন্ ! কেন যষ্টব্যমজেনাহোস্বিদৌষধৈঃ ?" ১০
"এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি প্রমাণং নো ভবান্ মতঃ।
স তান্ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা পরিপপ্রচ্ছ বৈ বসুঃ" ॥ ১১ ॥
"কস্য বৈ কো মতঃ কামো ব্রূত সত্যং দ্বিজোত্তমাঃ।
ধান্যৈর্যষ্টব্যমিত্যেব পক্ষোহস্মাকং নরাধিপ" ॥১২॥
"দেবানাস্তু পশুঃ পক্ষো মতো রাজন্ ! বদস্ব নঃ।

ভীষ্ম উবাচ—

দেবানাং তু মতং জ্ঞাত্বা বসুনা পক্ষসংশ্রয়াৎ" ॥ ১৩ ॥
"ছাগেনাজেন যষ্টব্যমেবমুক্তং বচস্তদা।
কুপিতাস্তে ততঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ" ॥ ১৪ ॥
"ঊচুর্ব্বসুং বিমানস্থং দেবপক্ষার্থবাদিনম্।
সুরপক্ষো গৃহীতস্তে যস্মাত্তস্মাদ্ দিবঃ পত" ॥ ১৫ ॥

ভাবার্থ—রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নিরতিশয় ভগবদ্ভক্ত রাজা বসু স্বর্গচ্যুত হইয়া কিজন্য ভূমধ্যে প্রবিষ্ঠ হইলেন ? ইহার উত্তরে ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াছিলেন যে, হে যুধিষ্ঠির ! এবিষয়ে প্রাচিনেরা ঋষিগণ ও ত্রিদশবর্গের সংবাদ সম্বলিত যে পুরাতন ইতিহাস কহিয়া থাকেন, সেই বিবাদাস্পদ পুরাতন ইতিহাস আমি তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। দেবগণ দ্বিজোত্তম সকলকে কহিয়াছিলেন যে, অজ দ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে, "অজ" শব্দের অর্থ ছাগ, অন্য পশু

নহে। ঋষিগণ বলিলেন, যজ্ঞকালে বীজদ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে, ইহাই বৈদিকীশ্রুতি। "অজ" শব্দের অর্থ বীজ, অতএব ছাগ হনন করা উচিত নহে। হে দেবগণ! যজ্ঞে পশু হনন করা সাধুগণের ধর্ম্ম নহে; এই সত্যযুগ সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব এই যুগে পশুহিংসা কি প্রকারে হইতে পারে? ভীষ্ম বলিলেন, এইরূপে দেবগণের সহিত ঋষিগণের বিবাদ হইতে থাকিলে, অন্তরীক্ষচর নৃপশ্রেষ্ঠ সমগ্র বলবাহন সম্পন্ন শ্রীমান্ রাজা বসু তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্বিজাতিগণ সেই আকাশগামী বসুকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন যে, ইনিই আমাদের সংশয়াপনোদন করিবেন, এই মহাত্মা বসু বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছেন, ইনি দান-পতি শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বপ্রাণির হিতপ্রিয়, অতএব ইনি কখন অন্যথা বাক্য বলিবেন না। ত্রিদশগণ ও ঋষিগণ এইরূপ বিবেচনা করতঃ সেই বসুরাজের নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে রাজন্! অজ অথবা ওষধি এই অন্যতরের মধ্যে কোন্ বস্তুদ্বারা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য? আপনি আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন, আপনার বাক্যই আমরা প্রমাণ স্বরূপ মান্য করিব। রাজা বসু কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগের মধ্যে কাহার কি মত, তাহা সত্য করিয়া প্রকাশ করুণ। ঋষিগণ কহিলেন যে, হে নরাধিপ! ধান্য দ্বারা যাগ করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমাদের পক্ষ, আর দেবগণের পশুদ্বারা যজ্ঞ করাই মত। অতএব হে রাজন্! আমাদের এই সংশয় আপনি অপনোদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজা বসু দেবগণের মত জানিয়া তৎপক্ষ আশ্রয় করতঃ ছাগ দ্বারা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য, এই কথা বলিলেন। অনন্তর সূর্য্যসম তেজস্বী সমস্ত মুণিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবপক্ষপাতি বিমানস্থ বসুকে বলিলেন যে, রাজন্! যেহেতু তুমি সুবপক্ষ গ্রহণ করিলে, সেইজন্য তুমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতলে পতিত হও। ঋষিগণের শাপপ্রভাবে রাজা বসু তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়া নরকগামী হইলেন।

এক্ষণে পূর্ব্বকথিত শ্লোক হইতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, যজ্ঞোপলক্ষে পশুহত্যাও সম্যক্‌রূপে নিষিদ্ধ। রাজা বসুর ন্যায় সত্যবাদী নরাধিপ দাক্ষিণ্যের বশীভূত হইয়া অর্থকে অনর্থ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং যখন অনর্থের ভাগী হইলেন, এবং দেবগণের অশেষবিধ প্রযত্নে কালক্রমে উদ্ধার পাইলেন, তখন বর্ত্তমান কলিযুগে মাংসলোভী যাজক্, নিরীহ শাস্ত্রমর্ম্মাভিজ্ঞ স্বর্গকামী যজমানকে অযথা উপদেশ দিয়া যে নরকস্থ করান্ এবং তাহার ধর্ম্ম ও অর্থ নাশের কারণ হইয়া স্বয়ংও নরকগামী হন্, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঋষিগণ এবং মুনিগণ এবং যে সকল ব্যক্তি অহিংসা ধর্ম্মের আদর করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে "অজ" শব্দের অর্থ পুরাতন ধান্য ব্যতিত অন্য বস্তু নহে, এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শাব্দাদি কোন প্রকার প্রমাণের বিরোধ নাই। আর বৃদ্ধব্যক্তিগণ যে উহার তিনপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, উহা মুনিগণের মতে কেবল ভূতার্থবাদরূপ অর্থবাদ মাত্র, পরন্তু গুণবাদ, অনুবাদ-রূপ নহে। কারণ বিরোধ বিষয়েই গুণবাদ হইয়া থাকে; যেমন কোন লোক প্রস্তরের উপর বসিয়া সন্ধ্যা করিলে, যদি

কেহ ঐ পাথরকে "সন্ধ্যাবান্ প্রস্তর" এইরূপ বলে, তবে সন্ধ্যাবান্ এবং প্রস্তরের বিভিন্নতা প্রত্যক্ষবাধিত হইল, তথাপি গুণস্তুতিরূপ বাক্য প্রয়োগ হইল বলিয়া, উহার অর্থ গুণবাদরূপে গণনা হইতে পারে। কিন্তু মুনিগণের মতের কোন বিরোধ নাই, তজ্জন্য উহার অর্থ গুণবাদরূপ হইবে না। আর নিশ্চিতার্থতেও অনুবাদরূপ অর্থবাদ হয়; যেমন— "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" অর্থাৎ অগ্নি হিমের ঔষধ, এ কথা সর্ব্বজন—প্রসিদ্ধ হইলেও বাক্যের প্রয়োগ অনুসারে উহার অনুবাদরূপ অর্থবাদ হইবে। ফলতঃ মুনিগণ "অজ" শব্দের অর্থ যে ধান্য করিয়াছেন, উহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ না হইলেও অনুবাদরূপ অর্থবাদ হইতে পারে না। অথচ যেখানে বিরোধ এবং নিশ্চিতার্থ উভয়েরই অভাব, সেখানে ভূতার্থবাদ অর্থই হইবে। যেমন—"রাবণঃ সীতাং জহার" অর্থাৎ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল, ইহাতে কোনরূপ বিরোধ অর্থ নাই অথবা পূর্ব্বেও ছিল না, পরন্তু বাক্যও অযথা নহে। সেইরূপ মুনিগণ ভূতার্থবাদ লইয়াই "অজ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, দেবগণ "পশু" অর্থ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুসারে উহা পূর্ব্বেই দুষিত হইয়াছে; শাস্ত্র প্রমাণেও ঐরূপ অর্থ দুষিত। আর অনুভব ও লৌকিক্ ব্যবহারেও দুষিত, কারণ পশু হননের কালে ঘাতকের মনোবৃত্তি, শরীরাকৃতি প্রভৃতিতে অতিশয় ক্রূরতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়।

পাঠকগণ! "পশুহত্যা হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়," এ কথা বুদ্ধিমান লোকের অনুভবে ঠিক বলিয়া মনে হয় না,

কারণ "যদ্ দীয়তে তৎ প্রাপ্যতে" অর্থাৎ "যাহা দিবে তাহাই পাইবে" এই ন্যায়ানুগত বাক্যানুসারে, সুখদাতা সুখ, দুঃখদাতা দুঃখ, অভয়দাতা অভয় এবং ভয়দ পুরুষ ভয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যজ্ঞে যে পশু হনন করে তাহাকে নির্ভয় অথবা সুখী দেখা যায় না, বরং ভয়ার্ত্ত এবং অতিশয় ক্ষিপ্ত দেখা যায়। এ অবস্থায় ঘাতক স্বর্গে কি প্রকারে যাইবে? আর লৌকিক ব্যবহারেও কোন সদ্বংশজাত পুরুষ মৃতজীব স্পর্শ করে না, যে মৃত স্পর্শ করে তাহাকে অধম জাতি গণনা করা যায়। এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক যে, যাজ্ঞিকগণ বেদ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ মণ্ডপে পশুর মুখ আহার্য্য উপকরণ দ্বারা রোধ করিয়া দেন এবং উহাকে মুষ্ট্যাদি প্রহার দ্বারা গতপ্রাণ করেন; তদনন্তর উহার শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কতক অংশ হোম করেন, অধিকাংশ স্বয়ং আহার করেন এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা, যাঁহারা যজ্ঞ দেখিতে আসেন তাঁহাদের প্রসাদরূপে প্রদান করেন। অতএব ঐ সকল যাজ্ঞিক ব্যক্তিকে যেরূপ গণনা করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ের বিচার আমি পাঠকগণের উপর নির্ভর করিলাম।

উপরোক্ত বাক্য হইতে ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, কোন কারণ উপলক্ষ করিয়া যজ্ঞে পশু বধ করা উচিত নহে। পরম ভাগবত রাজা বসু যখন দানীশ্বর, সত্যবাদী-শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতের প্রিয় হইলেও "অজ" শব্দের পশু অর্থ করার নিমিত্ত নরকস্থ হইলেন, তখন সাধারণ মনুষ্যের কি গতি হইবে? এস্থলে মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১১৬ অধ্যায়ে রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে অহিংসাবিষয়ক যে প্রশ্ন

করিয়াছিলেন, (মাংস ভক্ষণ করিলে কিরূপ দোষ হয়, এবং উহা ত্যাগ করিলে কি গুণ হয়) সেই বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা—

"ইমে বৈ মানবা লোকে নৃশংসা মাংসগৃদ্ধিনঃ।
বিসৃজ্য বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ মহারক্ষোগণাইব" ॥ ১ ॥
"অপূপান্ বিবিধাকারান্ শাকানি বিবিধানি চ।
খাণ্ডবান্ রসয়োগাংশ্চ তথেচ্ছন্তি যথামিষম্" ॥ ২ ॥
"তত্র মে বুদ্ধিরত্রৈব বিষয়ে পরিমুহ্যতে।
ন মন্যে রসতঃ কিঞ্চিন্মাংসতোঽস্তীতি কিঞ্চন" ॥ ৩ ॥
"তদিচ্ছামি গুণান্ শ্রোতুং মাংসস্যাভক্ষণে প্রভো।
ভক্ষণে চৈব যে দোষাস্তাংশ্চৈব পুরুষর্ষভ" ॥ ৪ ॥
"সর্ব্বং তত্ত্বেন ধর্ম্মজ্ঞ! যথাবদিহ ধর্ম্মতঃ।
কিঞ্চ ভক্ষ্যমভক্ষ্যম্বা সর্ব্বমেতদ্ বদস্ব মে" ॥ ৫ ॥
"যথৈতদ্ যাদৃশঞ্চৈব গুণা যে চাস্য বর্জ্জনে।
দোষা ভক্ষয়তো যেঽপি তন্মে ব্রুহি পিতামহ" ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ—লোকমধ্যে এই সমস্ত নৃশংস মাংসভোজী মানবগণ বিবিধ ভক্ষদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া মহারাক্ষস সমূহের ন্যায় আমিষ ভক্ষণে যাদৃশ অভিলাষ প্রকাশ করে, বিবিধাকার অপূপ, নানাবিধ শাক ও রসযুক্ত পক্কান্ন ভক্ষণে তাদৃশ ইচ্ছা প্রকাশ করে না; অতএব এবিষয়ের বিবেচনা পক্ষে আমার বুদ্ধি নিতান্ত মুগ্ধ হইতেছে। আমি বিবেচনা করি মাংস অপেক্ষা সুমধুর রসযুক্ত পদার্থ আর কিছুই নাই। হে প্রভো! মাংসের অভক্ষণে যে ফল হয় এবং ভক্ষণ করিলে যে দোষ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ধর্ম্মজ্ঞ!

কি ভক্ষ্য এবং কি অভক্ষ্য তৎসমুদয় যথাবৎ ধর্ম্মতঃ কীর্ত্তন করুন্—অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করিলে যে যে দোষ হয় এবং ইহার বর্জ্জনে যে যে গুণ হয়, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভীষ্ম উবাচ—

"এবমেতন্মহাবাহো ! যথা বদসি ভারত।
ন মাংসাৎ পরমং কিঞ্চিদ্রসতো বিদ্যতে ভুবি" ॥ ৭ ॥

"ক্ষতক্ষীণাভিতপ্তানাং গ্রাম্যধর্ম্মরতাত্মনাম্।
অধ্বনা কর্ষিতানাঞ্চ ন মাংসাদ্বিদ্যতে পরম্" ॥ ৮ ॥

"সদ্যো বর্দ্ধয়তি প্রাণান্ পুষ্টিমগ্র্যাং দধাতি চ।
ন ভক্ষ্যোঽভ্যধিকঃ কশ্চিন্মাংসাদস্তি পরন্তপ" ॥ ৯ ॥

"বিবর্জ্জিতে তু বহবো গুণাঃ কৌরবনন্দন।
যে ভবন্তি মনুষ্যাণাং তান্ মে নিগদতঃ শৃণু" ॥ ১০ ॥

"স্বমাংসং পরমাংসেন যোবর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ" ॥ ১১ ॥

"নহি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
তস্মাৎ দয়াং নরঃ কুর্য্যাৎ যথাত্মনি তথাপরে" ॥ ১২ ॥

"শুক্রাচ্চ তাত ! সম্ভূতির্মাংসস্যেহ ন সংশয়ঃ।
ভক্ষণে তু মহান্ দোষো নিবৃত্ত্যা পুণ্যমুচ্যতে" ॥ ১৩ ॥

"যৎ সর্ব্বেষ্বিহ ভূতেষু দয়া কৌরবনন্দন।
ন ভয়ং বিদ্যতে জাতু নরস্যেহ দয়াবতঃ" ॥ ২০ ॥

"দয়াবতামিমে লোকাঃ পরেচাঽপি তপস্বিনাম্।
অহিংসা লক্ষণো ধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ" ॥ ২১ ॥

"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ।
অভয়ং তস্য ভূতানি দদতীত্যনুশুশ্রুম" ॥ ২৩ ॥

"ক্ষতঞ্চ স্খলিতং চৈব পতিতং ক্লিষ্টমাহতম্।
সর্ব্বভূতানি রক্ষন্তি সমেষু বিষমেষু চ" ॥ ২৪।
"নৈনং ব্যালমৃগা ঘ্নন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
মুচ্যতে ভয়কালেষু মোক্ষয়েৎ যো ভয়ে পরান্" ॥ ২৫ ॥
"প্রাণদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদস্তীহ নিশ্চিতম্" ॥ ২৬ ॥
"অনিষ্টং সর্ব্বভূতানাং মরণং নাম ভারত।
মৃত্যুকালে হি ভূতানাং সদ্যো জায়তে বেপথুঃ" ॥ ২৭ ॥
"জাতিজন্ম জরাদুঃখৈর্নিত্যং সংসারসাগরে।
জন্তবঃ পরিবর্ত্তন্তে মরণাদুদ্বিজন্তি চ" ॥ ২৮ ॥
"নাত্মনোঽস্তি প্রিয়তরঃ পৃথিবীমনুসৃত্য হ।
তস্মাৎ প্রাণিষু সর্ব্বেষু দয়াবানাত্মবান্ ভবেৎ" ॥ ৩২ ॥
"সর্ব্বমাংসানি যো রাজন্ ! যাবজ্জীবং ন ভক্ষয়েৎ।
স্বর্গে স বিপুলং স্থানং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ" ॥ ৩৩ ॥
"যে ভক্ষয়ন্তি মাংসানি ভূতানাং জীবিতৈষিণাম্।
ভক্ষ্যন্তে তেঽপি ভূতৈস্তৈরিতি মে নাস্তিসংশয়ঃ" ॥ ৩৪ ॥
"মাং স ভক্ষয়তে যস্মাৎ ভক্ষয়িষ্যে তমপ্যহম্।
এতদ্ মাংসস্য মাংসত্বমনুবুদ্ধ্যস্ব ভারত !" ॥ ৩৫ ॥
"যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎফলমুপাশ্নুতে" ॥ ৩৭ ।
"অহিংসা পরমোধর্ম্মস্তথাহিংসা পরো দমঃ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ" ॥ ৩৮ ॥
"অহিংসা পরমো যজ্ঞস্তথাহিংসা পরং ফলম্।
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরম্ সুখং" ॥ ৩৯ ॥

"সর্ব্বযজ্ঞেষু বা দানং সর্ব্বতীর্থেষু বাপ্লুতম্।
সর্ব্বদানফলং বাপি নৈতত্তুল্যমহিংসয়া" ॥ ৪০ ॥
"অহিংস্রস্য তপোঽক্ষয্যমহিংস্রো যজতে সদা।
অহিংস্রঃ সর্ব্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা" । ৪১ ॥
"এতৎ ফলমহিংসায়া ভূয়শ্চ কুরুপুঙ্গব ! ।
নহি শক্যা গুণা বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি" ॥ ৪২ ॥
শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত, মহাভারত অনুশাসন
পর্ব্ব পত্র ১২৬-১২৭।

বিবেচনা—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি অতিশয় সরল, এজন্য উহাদের বিশেষ ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল সামান্যরূপ ভাবার্থ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

পিতামহ ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের উপরোক্ত প্রশ্ন গুলির উত্তর এইরূপ দিয়াছিলেন যে, হে ভারত ! যে সকল ব্যক্তি মাংসকে উত্তম খাদ্য বিবেচনা করে, তাহাদের বিষয় তোমাকে বিস্তারক্রমে বলিতেছি শুন। যাহারা ক্ষত শরীর, দুর্ব্বল, সন্তাপযুক্ত, বিষয়াশক্ত এবং পথশ্রান্ত, তাহারাই কেবল মাংসকে সর্ব্বোত্তম খাদ্য মনে করে, এবং তাহারাই বলে যে মাংস দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হয় ; কিন্তু যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা মাংসাহার কদাপি স্বীকার করেন না। হে কৌরবনন্দন ! মাংসাহার ত্যাগ করিলে যে যে ফল হয়, এস্থলে তাহার সামান্যরূপ দিগ্‌দর্শন নিরূপিত হইতেছে।

যে ব্যক্তি পরমাংস-দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সেই নির্দয় ব্যক্তি হইতে হিংসেতর সহস্র কুকর্ম্ম কারী পুরুষ বরং শ্রেষ্ঠ, কেননা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ

সংসারে অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই, অতএব মানব আপনাতে যেরূপ দয়া করিবে, অপরেও তদ্রূপ দয়া করিবে। হে যুধিষ্ঠির! শুক্র হইতে মাংস সমুৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, অতএব তাহা ভক্ষণ করিলে মহান্ দোষ এবং ভক্ষণ নিবৃত্তিকেই পুণ্য বলা যায়। হে যুধিষ্ঠির! সর্ব্বভূতে দয়াবান্ পুরুষের কদাচ ভয় হয় না, এবং দয়াবান্ তপস্বী ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোক জয় হয়, তজ্জন্য অহিংসা ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে মানব দয়াবান্ হইয়া সর্ব্বজীবে অভয়দান করেন, সকল জীবই তাঁহাকে অভয়দান করে, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সম ও বিষম উভয় কালেই সকল জীবকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মানবগণ স্বার্থের এতই অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়াও তাঁহারা দয়াধর্ম্ম পালনে বিমুখ থাকেন, এমন কি নিজের গৃহে পালিত যে সকল গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতিকে অকর্ম্মণ্য দেখেন, তাঁহারা তাহাদিগকে কোন পশুশালায় রাখিয়া আসেন অথবা অন্য কাহাকেও বিক্রয় করেন। অনেক অজ্ঞানী ব্যক্তি ঐ প্রকার পশু কসাইকে বিক্রয় করে এবং কোন কোন নাস্তিক তাহাদের গুলি করিয়া বধ করে। দেখা যায়, যে সকল মনুষ্যের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার নাই এবং যাহারা কেবল স্বার্থেরই বশীভূত, তাহারাই এইরূপ নির্দয় হইয়া থাকে, পরন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ঐরূপ অকর্ম্মণ্য পশুগণকে পালন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা নিঃস্বার্থ দয়াবান্, সিংহ ব্যাঘ্র পিশাচ রাক্ষস প্রভৃতি ক্রূর প্রাণিগণ কখন তাঁহাদের কোন উপদ্রব করে

না। এই সংসারে প্রাণদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান অন্য কিছুই নাই। হে ভারত! প্রাণিগণের পক্ষে মৃত্যুর সমান অশুভ-কর কোন পদার্থই জগতে দেখা যায় না, যেহেতু মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অতিশয় সামর্থবান্ পুরুষেরও ভয় হইয়া থাকে। সমাধিস্থ অবস্থায় যে মহানুভাব পুরুষের মৃত্যু হয়, তাঁহারও স্বেদ কম্পাদিরূপ স্বাভাবিক শরীরধর্ম্ম অবশ্যই হইয়া থাকে। দেখুন্—যোগিগণ যোগবলে পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যখন শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগে যত্নবান্ হন, তদবস্থায় থাকিয়াও শারীরিক যন্ত্রাদির পীড়াহেতু তাঁহাদের শরীর এবং হস্ত পদাদি কম্পিত হয়। পুরুষ ধ্যানমগ্নাবস্থায় থাকিলে যদি কোনরূপ শারীরিক দুঃখপ্রদ অবস্থা প্রাপ্ত হন্, তবে অবশ্য তাঁহার শরীরে সঞ্চালনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে ধ্যানভ্রষ্ট বলা যাইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ আছে যে মহাবীরদেব অতিশয় বলবান এবং অচলের ন্যায় নিষ্কম্প ও পৃথিবীর সমান দৃঢ় ছিলেন, তথাপি কর্ণকীলকার্পণ সময়ে তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহাতে এরূপ বুঝা উচিত নয় যে ভগবান ধ্যানভ্রষ্ট হইয়া পৌদ্গলিক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরন্তু উহা কেবল তাঁহার শরীরের ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছিল।

আজকাল অস্ত্র বিদ্যাকুশল ডাক্তারগণ রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা অচেতন করিয়া তাহার শরীরের দূষিত অংশ ছেদন করেন এবং রোগী অচেতন অবস্থায় হাত পা নাড়িতে থাকিলে তিন চারিজন তাহাকে ধরিয়া রাখে এবং সেই অবস্থায় রোগী নানা প্রকার অস্ফুট শব্দও করে, কিন্তু যখন

ঔষধের প্রভাব অপসৃত হয় এবং রোগী সচেতন অবস্থা প্রাপ্তহয় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে প্রকৃতরূপ কোন উত্তর দিতে পারে না, বরং ইহাই বলে যে "আমার কিছু মনে নাই"। অতএব জানা গেল যে কম্পাদি লক্ষণ কেবল শরীরেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আত্মার নহে; পরন্তু জীবনান্ত পর্য্যন্ত যে আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ আছে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ মৃত শরীরের কোন রূপ চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হয় না, জীবিত থাকিতেই শরীরের স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা চালনাদি কার্য্য উপলব্ধি হয় এবং ঐ সকল চিহ্ন দুঃখরূপ কার্য্যের জ্ঞাপক, কারণ মৃত্যুকালে প্রায় উক্ত চিহ্ন সকল সংসারী জীবেতে দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য হিংসা পরিত্যাগ করিবে, এবং আপনার আত্মাকে যেরূপ দেখিবে অপরেরও সেইরূপ দেখিবে। যদ্যপি সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করা যায়, তাহা হইলে জানা যায় যে, সকল জীবেরই প্রাণাপেক্ষা আর কোন জিনিষ প্রিয়তর নাই, সুতরাং যে ব্যক্তি সকল জীবে দয়াশীল, তিনিই যথার্থ আত্মতত্ত্বজ্ঞ। এই জন্য পিতামহ ভীষ্মদেব, রাজা যুধিষ্ঠিরকে দয়ার বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলেন যে, হে রাজন্! যে ব্যক্তি আজীবন মাংসাহার ত্যাগ করে, সে স্বর্গে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যদ্যপি মহাভারত হিন্দুদিগের পঞ্চম বেদরূপে পরিগণিত হয়, তবে অনুশাসন পর্ব্বে উক্ত শ্লোক গুলির মর্ম্ম, (যাহাতে দান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনের সময় ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট অহিংসাধর্ম্মের ফল বর্ণনা করিয়াছেন) হিন্দু-

গণ কি জন্য হৃদয়ঙ্গম না করেন? এক্ষণে আমি উহার বিস্তার বর্ণন না করিয়া কেবল শেষোক্ত শ্লোকের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পাঠক মহাশয়গণের গোচর করিতেছি—

হে কুরুপুঙ্গব! অহিংসাধর্ম্মের যে কত ফল তাহা শতবর্ষ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াও কেহ শেষ করিতে পারে না, উহাতে স্বর্গ ও মোক্ষ অনায়াসলভ্য হয়। অন্তিম শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোকেও লিখিত হইয়াছে যে সম্পূর্ণ যজ্ঞ, দান, সকল তীর্থে স্নান এবং সকল প্রকার দান হইতে যে ফল লাভ হয় উহা কদাচ অহিংসার সমান হয় না, যেহেতু হিংসাকারী গর্ভ-বাস এবং নরক যন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করে। এ কথা উক্ত অধ্যায়ের নিম্ন শ্লোক দেখিলেই জানিতে পারিবেন। যথা—

"গর্ভবাসেষু পচ্যন্তে ক্ষারাম্লকটুকৈ রসৈঃ।
মূত্রস্বেদপুরীষাণাং পরুষৈর্ভৃশদারুণৈঃ॥ ২৯॥

"জাতাশ্চাপ্যবশাস্তত্র ছিদ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ।
পাচ্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তে বিবশা মাংসগৃদ্ধিনঃ" ॥ ৩০॥

"কুম্ভীপাকেচ পচ্যন্তে তাং তাং যোনিমুপাগতাঃ।
আক্রম্য মার্য্যমাণাশ্চ ভ্রাম্যন্তে বৈ পুনঃ পুনঃ" ॥৩১॥

ভাবার্থ—ক্ষার, অম্ল এবং কটুরস দ্বারা মাংসাশী পুরুষ গর্ভবাসের সময় পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, আর মলমূত্রাদির দ্বারা ভয়ঙ্কর দুঃখও প্রাপ্ত হয়, এবং নরকগতিতে উৎপত্তির সময়ও অবশ হইয়া বারম্বার নরকে যায়, আর সেই সেই যোনিতে গেলেও কুম্ভীপাকে পচ্যমান হয়, এবং তথায় সেই নারকী জীব নানা প্রকার শস্ত্রের দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া যম-দূতগণ কর্ত্তৃক অসিপত্রাদি বনমধ্যে নীত হয়, যে পত্র পতিত

হইবা মাত্র সেই দুষ্ট নারকীর শিরশ্ছেদ হয়। এইরূপে নরকপালগণ তথা হইতে পুনশ্চ তাহাকে অন্যত্র লইয়া যায়। দেখুন্—এবম্বিধ যন্ত্রণা মাংসাহারী জীব প্রায়ই অনুভব করে, তজ্জন্য পরপ্রাণ দ্বারা স্বপ্রাণ রক্ষাকারীকে মূর্খ শিরোমণি গণনা করা উচিত। অতএব সমস্ত নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রেতে পরোকারের জন্য ক্ষণভঙ্গুর শরীরের উপর মোহ করা নিষেধ। যথা—

"জীবিতং হি পরিত্যজ্য বহবঃ সাধবো জনাঃ।
স্বমাংসৈঃ পরমাংসানি পরিপাল্য দিবং গতাঃ" ॥১৮॥

ভাবার্থ—অনেক সাধুব্যক্তি আপনার জীবনের মূর্চ্ছা (মোহ) ত্যাগ করিয়া, নিজ মাংস দ্বারা অপরের মাংস রক্ষা করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইত্যাদি অনেক শ্লোক মাংস ত্যাগের জন্য মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে দেখা যায়। উহা হইতে সামান্য শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"পুত্র মাংসোপমং জানন্ খাদতে যো বিচক্ষণঃ।
মাংসং মোহসমাযুক্তঃ পুরুষঃ সোঽধমঃ স্মৃতঃ ॥১১॥

অধ্যায় ১১৪

"যো যজেতাশ্বমেধেন মাসি মাসি যতব্রতঃ।
বর্জ্জয়েৎ মধুমাংসঞ্চ সমমেতদ্ যুধিষ্ঠির" ॥১০॥

"ন ভক্ষয়তি যো মাংসং ন চ হন্যাদ্ ন ঘাতয়েৎ।
তদ্ মিত্রং সর্ব্বভূতানাং মনুঃস্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ" ॥১২॥

"স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নারদঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা নিয়তং সোঽবসীদতি" ॥১৪॥

"মাসি মাস্যশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।

ন খাদতি চ যো মাংসং সমমেতন্মতং মম” ॥১৬॥
“সর্ব্বে বেদা ন তৎকুর্য্যুঃ সর্ব্বে যজ্ঞাশ্চ ভারত ॥
যো ভক্ষয়িত্বা মাংসানি পশ্চাদপি নিবর্ত্ততে” ॥১৮॥
“সর্ব্বভূতেষু যো বিদ্বান্ দদাত্যভয় দক্ষিণাম্।
দাতা ভবতি লোকে স প্রাণানাং নাত্রসংশয়ঃ”ঃ ॥২০॥

অধ্যায় ১১৫

মহাভারতে এইরূপ অনেক শ্লোক আছে, সেই গুলি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অবশ্য দেখা উচিত। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক গুলিতে সমস্ত শাস্ত্রের রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে; অতএব জীবনের ইচ্ছা না করিয়া যে সৎপুরুষ এইসংসারে স্বমাংসের দ্বারা পর-মাংস রক্ষা করে অর্থাৎ জীবনান্ত পর্য্যন্ত পরোপকার করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি দেবলোকের সুখ প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি মাংসকে তুচ্ছ এবং স্বপুত্রের মাংস তুল্য জ্ঞান করিয়াও মোহবশতঃ তাহা ভক্ষণ করে, তাহার অপেক্ষা অধার্ম্মিক কেহ নাই, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে মাংসত্যাগী ব্যক্তিকেই ধর্ম্মাত্মা গণনা করে। এইজন্য লিখিত আছে যে যদি কোন মনুষ্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিমাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, এবং অন্য কেহ কেবল মাংসাহার ত্যাগ করে, তবে তাহাদের তুল্য ফললাভ হয়। যদি ভুলক্রমে কেহ মাংসাহার করে এবং পশ্চাৎ উহা ত্যাগ করে, তাহা হইলে চতুর্ব্বেদ পাঠে এবং সমগ্র যজ্ঞ ক্রিয়া সাধনে যে ফললাভ না হয়, শুদ্ধ মাংস ত্যাগ করিলে ততোধিক ফললাভ হইয়া থাকে। পাঠকবর্গ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শাস্ত্রে এরূপ সহজ এবং সরল উপদেশ থাকা সত্ত্বেও মনুষ্য নিজ কর্ম্মদোষে ঐ প্রকার কদর্য্য

প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হয়। আর ইহাও অতিশয় অনুতাপের বিষয় যে, অনেক মাংসাহারীব্যক্তি চতুরতার অনুবর্ত্তী হইয়া নূতন নূতন কাল্পনিক শ্লোক রচনা করতঃ ভব্য-মনুষ্যগণকে ভ্রমজালে নিবদ্ধ করিবার জন্য প্রযত্ন করেন। যথা—

"কেচিদ্ বদন্ত্যমৃতমস্তি পুরে সুরাণাং
কেচিদ্ বদন্তি বনিতাঽধরপল্লবেষু।
"ব্রূমো বয়ং সকলশাস্ত্রবিচারদক্ষা
জম্বীরনীর পরিপূরিত মৎস্যখণ্ডে" ॥১॥

অর্থাৎ—কেহ বলে যে দেবলোকে এবং কেহ বলে স্ত্রিগণের অধরোষ্ঠ পল্লবে অমৃত আছে, কিন্তু স্বর্ব্বশাস্ত্র বিচারদক্ষ আমরা (মাংসাহারী) বলি যে জম্বীর রসপূর্ণ মৎস-খণ্ডেই অমৃতাস্বাদ পাওয়া যায়।

সজ্জনগণ! কিন্তু তত্ত্ববেত্তাগণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তৃতীয় পাদে "ব্রূমো বয়ং সকলশাস্ত্রবিচারশূন্যাঃ" এইরূপ প্রকৃত পাঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কেবল বিচারশূন্য মনুষ্যগণ সদ্‌বুদ্ধির অভাবে উহার প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করিয়া (যেমন দেবকে অদেব, অদেবকে দেব, গুরুকে অগুরু এবং অগুরুকে গুরু, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, তত্ত্বকে অতত্ত্ব এবং অতত্ত্বকে তত্ত্ব, ভক্ষ্যকে অভক্ষ্য এবং অভক্ষ্যকে ভক্ষ্য—ইত্যাদি) মহাভ্রমে পতিত এবং সংসার সাগরে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। এইজন্য সাধারণ লোকের কল্পিত বাক্যের সমাদর না করিয়া কেবল অহিংসাধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। যাহারা মাংসরস-লোলুপ, তাহারাই স্বেচ্ছানুসারে কল্পিত শ্লোক রচনা করিয়া থাকে। যথা—

"রোহিতো নঃ প্রিয়করঃ মদ্গারো মদ্গুরুপ্রিয়ঃ।
হিল্সীতু ঘৃতপীযূষো বাচা বাচামগোচরঃ" ॥ ঃ ॥

ভাবার্থ—কেহ কহে যে রোহিত মৎস্য আমার অত্যন্ত প্রিয়, আর মাগুর মৎস্য আমার গুরুর প্রিয় এবং ইলীস মৎস্য ঘৃত এবং অমৃতের সমান, আর বাচা মৎস্যের স্বাদ বাক্যের অতীত। দেখুন—এইরূপ কল্পিত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ লোককে ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করান। পূর্ব্ব কথিত শ্লোক বঙ্গদেশের লোকে প্রায় কহিয়া থাকে, এবং "কেচিদ্ বদন্ত্যমৃতমস্তি পুরে সুরাণামিত্যাদি" শ্লোক প্রায় মৈথিলীরা কহে। বঙ্গদেশ নিবাসী লোকদের মধ্যে অনেকের মৎস্যাহার প্রভৃতি কুৎসিত ব্যবহার দেখিয়া কবিগণ হাস্যোদ্দীপক অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ মৈথিলীদের ব্যবহার দেখিয়া কোন কবি অবতার সংখ্যা বর্ণনাচ্ছলে ভগবান্ নৃসিংহদেবকে লক্ষ্য করিয়া নিম্ন লিখিত বিদ্রূপাত্মক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যথা—

"অবতারত্রয়ং বিষ্ণোর্মৈথিলৈঃ কবলীকৃতম্।
ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ নারসিংহং বপুর্দধৌ" ॥ ১ ॥

ভাবার্থ—ভগবান বিষ্ণু প্রথমতঃ মৎস্য, কচ্ছপ ও বরাহ এই তিন অবতার ধারণ করেন, পরন্তু মৈথিলীরা সে গুলি ভক্ষণ করিয়াছে, তজ্জন্য ভগবান ক্রোধবশতঃ নরসিংহ মূর্ত্তী ধারণ করিলেন, কেননা মৈথিলীরা এই মূর্ত্তী ভক্ষণ করিলে স্বয়ংই ভক্ষিত হইবে। উক্ত শ্লোক বিদ্রূপাত্মক হইলেও মৈথিলিগণ মৎস্যাদি প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই।

সাধারণতঃ এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে যে, যাহার

বংশে সুপণ্ডিত অথবা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কুল-মর্য্যাদা অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, এবং সেই কুলের কেহ আপদ্-গ্রস্ত হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে অনেকে প্রস্তুত হয়। পরন্তু লোকে যাঁহাকে ভগবান বলিয়া মান্য করে, সেই ভগ-বানের অবতার যে জাতিতে হইয়াছে, সেই জাতিকে রক্ষা করার পরিবর্ত্তে যদ্যপি কেবল তাহার বিনাশই সাধিত হয়, তবে তাহা কিদৃশ গর্হিত কার্য্য সে বিষয় নিশ্চয় বিচারণীয়। আরও এক বিচার্য্য বিষয় এই, যে মাংস ভক্ষণ করে তাহার দ্বারা সকল প্রকার মাংসই ভক্ষিত হয়, একথা মনুস্মৃতি ৫ম অধ্যায় ১৫শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে। যথা—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মাদ্ মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ" ॥

ভাবার্থ—যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে তাহাকে তাহার ভক্ষক বলা যায়, যেমন বিড়াল ইঁদুর খায় বলিয়া বিড়ালকে মূষখাদক বলে, সেইরূপ মৎস্যাহারীকে মৎস্যখাদক বলে। কিন্তু মৎস্যাহারীকে কেবল যে মৎস্যখাদক কহে তাহা নহে, পরন্তু তাহাকে সকলজীবের মাংসাহারী গণনা করা হয়। অতএব মৎস্য ভক্ষণ না করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। জাতি, ধর্ম্ম এবং বংশের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত মৎস্যাহার ত্যাগ করিবে।

বিবেচনা—মৎস্যাহারীকে যে সর্ব্বমাংসাহারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে কথা মিথ্যা নহে, কারণ মৎস্য সকল পদার্থই ভক্ষণ করে; সমুদ্র এবং নদীতে কোন জীবের মৃত শরীর পতিত হইলে, মৎস্যগণ আনন্দের সহিত উহা ভক্ষণ করে, এবং শরীরের সঙ্গে সেই দেহাবস্থিত মল মূত্রাদি পর্য্যন্ত

খায়, তখন মৎস্য যিনি আহার করেন, তাঁহার দ্বারা অবশ্য সেই সকল মল মূত্রাদিও ভক্ষিত হয়। অতএব কল্যাণাভিলাষী ব্যক্তির এরূপ কুৎসিত আহার গ্রহণ করা বিহিত নহে। এক্ষণে মাংসাহার নিষিদ্ধ বিষয়ের কতকগুলি পৌরাণিক শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৯৬ অধ্যায়ে রাজা জনক ঋষিশ্রেষ্ঠ পরাশরকে প্রশ্ন করেন যে, কোন্ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। যথা—

জনক উবাচ—

"কানি কর্ম্মাণি ধর্ম্ম্যাণি লোকেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম।
ন হিংসন্তীহ ভূতানি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বদা" ॥ ৩৫ ॥

পরাশর উবাচ—

"শৃণু মেঽত্র মহারাজ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যানি কর্ম্মাণ্যহিংস্রাণি নরং ত্রায়ন্তি সর্ব্বদা" ॥ ৩৬ ॥

ভাবার্থ—প্রশ্ন, হে দ্বিজসত্তম! অহিংসা এবং হিংসা কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টী ধর্ম্মযোগ্য এবং কোন্‌টী অধর্ম্মযোগ্য? উত্তর—হে মহারাজ জনক! যে কার্য্য অহিংসা অর্থাৎ হিংসা দোষ রহিত, সেই কার্য্যই পুরুষকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। অতএব অহিংসা কার্য্যকে ধর্ম্ম এবং হিংসাকার্য্যকে অধর্ম্ম গণনা করা হয়। বারাহপুরাণেও উল্লেখ আছে যে—

জীবহিংসানিবৃত্তাস্তু সর্ব্বভূতহিতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বত্র সমতাযুক্তঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অধ্যায় ১২১

"হিংসাদীনি ন কুর্ব্বন্তি মধুমাংসবিবর্জ্জকাঃ।
মনসা ব্রাহ্মণীং চৈব যো গচ্ছেন্ন কদাচন ॥ ২৪ ॥

অধ্যায় ১২৫

"বিকর্ম্ম নাভিকুর্ব্বীত কৌমারব্রতসংস্থিতঃ।
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তঃ সত্ত্বেন চ সমন্বিতঃ ॥ ৫ ॥

অধ্যায় ১২২

"ন ভক্ষণীয়ং বারাহং মাংসং মৎস্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
অভক্ষ্যা ব্রহ্মণৈরেতে দীক্ষিতৈশ্চ নসংশয়ঃ ॥৩৪॥
"পরীবাদং ন কুর্ব্বীত ন হিংসাং বা কদাচন।
পৈশুন্যং ন চ কর্ত্তব্যং স্তৈন্যং বাপি কদাচন ॥৩৫॥

অধ্যায় ১২৭।

"নিত্যযুক্তশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো মম কর্ম্ম পরায়ণঃ।
অহিংসা পরমশ্চৈব সর্ব্বভূতদয়াপরঃ ॥৩৭॥

অধ্যায় ১১৭।

ভাবার্থ—বরাহপুরাণের কয়েকটী শ্লোক ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, পরন্তু উপরোক্ত শ্লোকগুলি তদপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ঐ গুলির সার তাৎপর্য্য এই যে জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত পুরুষ, সকল জীবের হিতকর, পবিত্র এবং সমভাবাপন্ন হন্, এবং তাঁহার পক্ষে লৌহ, প্রস্তর ও কাঞ্চন সকলই তুল্য। তিনি কোনরূপ হিংসাদি অনৃতকার্য্যে অনুরক্ত হন্ না এবং মধু ও মাংস বর্জ্জনপূর্ব্বক মনে মনেও পরস্ত্রী অথবা ব্রাহ্মণনারী প্রভৃতি গমনে বিরত থাকেন। এইরূপে তিনি ঘৃণিত কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক কৌমারব্রত পালন করেন এবং সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়াবান্ থাকিয়া সত্ত্ববান অবস্থায় অবস্থিত থাকেন।

বরাহমাংস ভক্ষণের অযোগ্য এবং মৎস্যও অভক্ষ্য, বিশেষতঃ দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণের উহা ভক্ষণ করা সর্ব্বথা অবিধেয়।

পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ এবং চৌর্য্য এই সকল সৎপুরুষের পরিত্যাগ করা উচিত। নিত্যকর্ম্মযুক্ত, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, ভগবদ্-কর্ম্ম পরায়ণ, অহিংসাধর্ম্ম পালন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবগণের প্রতি দয়াভাব ইত্যাদি অনেক উপদেশ বরাহপুরাণে লিখিত আছে, এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত বরাহপুরাণ দেখিলে পাঠকবর্গ সমস্ত জানিতে পারিবেন। কূর্ম্মপুরাণেও ঐরূপ অহিংসাধর্ম্ম পালনের শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নানৃতং বা বদেৎ ক্বচিৎ।
নাহিতং নাপ্রিয়ংব্রূয়াৎ ন স্তেনঃ স্যাৎ কথঞ্চন" ॥

অধ্যায় ১৬ পৃঃ ৫৫৩।

ভাবার্থ—সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা না করা, মিথ্যা না বলা, অহিত এবং অপ্রিয় বাক্য না বলা এবং কোন রূপে চুরি না করা কর্ত্তব্য।

বিবেচনা—পুরাণে হিংসা করা, চুরি করা, অহিত এবং অপ্রিয় বাক্য বলা এবং মিথ্যা কথা কহা নিষেধ। তথাপি স্বার্থান্ধ পুরুষ সেই সকল অমূল্য মহাবাক্য অনাদর করিয়া প্রাণিগণের যাহাতে অহিত এবং অপ্রিয় হয় সেই কার্য্যই করে, অপরকে করায় এবং কেহ করিলে তাহা উত্তম কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করে। যেখানে পশু বলি হয়, সেখানে কি জীবগণের অহিত এবং অপ্রিয় কার্য্য সাধিত হয় না? দেখুন—প্রাণ হইতে প্রিয়তর পদার্থ জগতে যে আর কিছু নাই, জৈনসিদ্ধান্ত এবং মহাভারত প্রভৃতিতে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু ইহাই এক্ষণে বিচারের বিষয় যে, যখন কোন জীবের প্রাণ বলিরূপে গৃহিত হয়, সেই সময় ঐ জীবের অবস্থা নিঃসন্দেহ

সম্পূর্ণ অহিত এবং অপ্রিয় অনুভব হইয়া থাকে।

কোন স্থানে যজ্ঞোপলক্ষে একটি ছাগল রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ডাকিতে থাকিলে, এক কবি তাহার রব শুনিয়া অলঙ্কারচ্ছলে বলিলেন যে, এই ছাগল বলিতেছে "আমাকে শীঘ্র স্বর্গে লইয়া চল"। দ্বিতীয় কবি বলিলেন যে, ছাগল রাজার কল্যাণ কামনা করিতেছে, যেহেতু যজ্ঞকারী-রাজা তাহাকে তৃণ ছাড়াইয়া স্বর্গে অমৃতভোজনের অধিকারী করিলেন। তৃতীয় কবি বলিলেন যে, ছাগল বৈদিকধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিতেছে যে, যদি বৈদিককার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে আমার ন্যায় অবোধ পশুর স্বর্গলাভ কেমন করিয়া ঘটিত? এবম্বিধ কবি-কল্পনার অন্দোলন হইতে থাকিলে, এক দয়াবান্ পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন যে, এই পশু যজ্ঞকারীকে বিনীতভাবে বলিতেছে—

"নাহং স্বর্গফলোপভোগতৃষিতো নাভ্যর্থিতস্ত্বং ময়া
সন্তুষ্টস্তৃণভক্ষণেন সততং সাধো ন যুক্তং তব।
স্বর্গে যান্তি যদি ত্বয়া বিনিহতা যজ্ঞে ধ্রুবং প্রাণিনো
যজ্ঞং কিং ন করোষি মাতৃপিতৃভিঃ পুত্রৈস্তথা বান্ধবৈঃ"॥

ভাবার্থ—হে যজ্ঞকারী মহারাজ! আমি স্বর্গফল ভোগ-লিপ্সু নহি এবং আমি তোমার নিকট তজ্জন্য প্রার্থনাও করি নাই, আমি কেবল তৃণমাত্র আহার পাইলে সর্ব্বদা সুখী হই। অতএব হে সজ্জন! তুমি এই যজ্ঞকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও। যদি যজ্ঞে পশুবধ করিলে সেই পশু স্বর্গগামী হয় ইহাই তোমার বিশ্বাস, তবে তুমি এই যজ্ঞে আপনার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের বধসাধন করিয়া কেন তাহাদের

স্বর্গগামী করিতেছ না ?

অহিংসাধর্ম্মপোষক প্রবন্ধ পুরাণ, স্মৃতি আদি নানা প্রকার গ্রন্থে রচিত হইয়াছে, সেই সকল উল্লেখ না করিয়া কেবল অহিংসার মহিমা ও অহিংসাধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তির অপূর্ব্ব-শক্তির বিষয় এবং হিংস্রক ব্যক্তির দুরবস্থার লক্ষণ এস্থানে বর্ণিত হইতেছে।

কলিকালসর্ব্বজ্ঞ শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য্য অহিংসার মহিমা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। যথা—

"মাতেব সর্ব্বভূতানামহিংসা হিতকারিণী।
অহিংসৈব হি সংসারমরাবমৃতসারণিঃ" ॥৫০॥
"অহিংসা দুঃখদাবাগ্নি প্রাবৃষেণ্যঘনাবলী।
ভবভ্রমিরুগার্ত্তানামহিংসা পরমৌষধী" ॥৫১॥

যোগ শাস্ত্র দ্বিঃ প্রঃ পৃঃ ২৮৫।

ভাবার্থ—অহিংসা সকল প্রাণির মঙ্গলদায়িনী মাতার ন্যায়, সংসার-রূপ মরুভূমিতে বারিপূর্ণ হ্রদের ন্যায়, দুঃখরূপ দাবানল নির্ব্বাপনের নিমিত্ত বর্ষাকালের বারিদবৃন্দের ন্যায় এবং ভবভ্রমণ-রূপ মহারোগে পীড়িত জীবগণের পক্ষে পরমৌ-ষধির ন্যায়। অহিংসাধর্ম্মকে সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানের মুকুট স্বরূপ দেখাইয়াছেন। যথা—

"হেমাদ্রিঃ পর্ব্বতানাং হরিরমৃতভুজাং চক্রবর্ত্তীনরাণাং
শীতাংশুর্জ্যোতিষাং স্বস্তরুরবনিরুহাং চণ্ডরোচীগ্র্হাণাম্।
"সিন্ধুস্তোয়াশয়ানাং জিনপতিরসুরামর্ত্ত্যমর্ত্ত্যাধিপানাং
যদ্বৎ তদ্বৎ ব্রতানামধিপতিপদবীং যাত্যহিংসা কিমন্যৎ" ॥

ভাবার্থ—যেরূপ পর্ব্বত সকলের হিমালয়, দেবগণের

ইন্দ্র, মনুষ্যগণের চক্রবর্ত্তী রাজা, জ্যোতির্মণ্ডলের চন্দ্রমা, বৃক্ষসকলের কল্পবৃক্ষ, গ্রহগণের সূর্য্য, জলাশয় সকলের সমুদ্র, বাসুদেব, বলদেব ও চক্রবর্ত্তী তথা চতুঃষষ্ঠি ইন্দ্রের মধ্যে বলিশ্রেষ্ঠ জিনরাজ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অহিংসা সকল প্রকার ব্রতানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অহিংসা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। কারণ শস্ত্রশূন্য সুভট, বিচারাক্ষম মন্ত্রী, দুর্গশূন্য নগর, নায়ক বিনা সেনাদল, দন্তহীন হস্তী, কলাশূন্য পুরুষ, তপস্যাশূন্য মুনি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পুরুষ, ব্রহ্মচর্য্য বিরত ব্রতী, স্বামীবিনা স্ত্রী, দানবিনা ধনাঢ্যের ধন, অস্বামীক প্রদেশ, বিদ্যাহীন বিপ্র, গন্ধহীন পুষ্প, নির্দ্দন্ত মুখ, বৃক্ষ ও কুসুম-শূন্য সরোবর, পাতিব্রত্যধর্ম্মহীন নারী যেরূপ শোভা পায় না, সেইরূপ দয়া বিনা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান শোভা পাইতে পারে না। পরন্তু দয়াবান্ পুরুষ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিযুক্ত বলিয়া তিনি গ্রহণীয়-বচন, পূজনীয়বাক্, মহান্‌কীর্ত্তি, পরম যোগী, শান্তিসেবধি, পরোপকারী, ব্রহ্মচারী ইত্যাদি গুণের দ্বারা অলঙ্কৃত হন্, তাঁহার ক্রোড়ে পক্ষিগণ আসিয়া নির্ভয়ে ক্রীড়া করে এবং ক্রূর পক্ষিগণ ক্রূর-স্বভাব-সুলভ আজন্ম-বৈরতা পরিহার পূর্ব্বক দয়াভাবে নিমগ্ন হইয়া সেই মহাত্মার উপদেশ-সুধা পান করিতে উৎসাহান্বিত হয়। এই জন্য যাহার উপরে দয়াদেবীর কৃপা হয়, সেই মহানুভাব পুরুষের চিত্তে সকল প্রকার অমল বুদ্ধি বিকাশ পায়, এবং সেই ব্যক্তিই জগতে পূজনীয় ও তাহারই মাহাত্ম্য বর্ণনার অতীত হইয়া থাকে। যথা—

“সারঙ্গী সিংহশাবং স্পৃশতি সুতধিয়া নন্দনী ব্যাঘ্রপোতং
মার্জ্জারী হংসবালং প্রণয়পরবশাৎ কেকিকান্তা ভুজঙ্গম্।

বৈরাণ্যাজন্মজাতান্যপি গলিতমদা জন্তবোঽন্যে ত্যজেয়ু
র্দৃষ্ট্বা সৌম্যৈকরূঢ়ং প্রশমিতকলুষং যোগিনং ক্ষীণমোহম্॥”

ভাবার্থ—শান্তি ও নিষ্পাপভাবে অবস্থিত যোগিগণকে দেখিয়া কতশত জীব জন্মজাত-বৈরতা জলাঞ্জলি দিয়াছে; হরিণী নিজ শাবকের ন্যায় সিংহশাবককে প্রীতির সহিত স্পর্শ করিতেছে, গাভী প্রেমাবেশে আকৃষ্ট হইয়া ব্যাঘ্রশাবকের সহিত স্বপুত্র বুদ্ধিতে বিচরণ করিতেছে, হংসশাবককে বিড়াল সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেছে এবং ময়ূরী সর্পের সহিত মিত্রতা করিতেছে—ইত্যাদি।

বিবেচনা—সকল জীবের প্রতি দয়াবান পুরুষই প্রকৃত মহাত্মানামে অভিহিত হন্। দয়াভাব যাহাতে অল্প পরিমাণেও দুষিত না হয়, এই মনে করিয়া সেই মহাত্মা ব্যক্তি অন্যান্য ধর্ম্মের নিয়মও পালন করিয়া থাকেন। কারণ সেই মহাত্মার অহিংসার উপরেই লক্ষ্য থাকে এবং অহিংসার বিষয়েই তিনি উপদেশ দিয়া থাকেন। যদি মধ্যস্থ বুদ্ধিতে সেই উপদেশের সিদ্ধান্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে সেই উপদেশ জীবদয়ারই অনুবর্ত্তক। কিন্তু কালান্তরে দয়া রহিত ব্যক্তিগণের মনোমধ্যে নানাপ্রকার কল্পনার উদ্রেক বশতঃ তাহারা অর্থকে অনর্থ করিয়াছে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে মহাভারতে ঋষিগণ “অজ” শব্দের অর্থ তিন বৎসরের পুরাতন ধান্য স্বীকার করিয়াছেন। যদিও কবিগণের মধ্যে অনেকে বলিদান শব্দ লইয়া নূতন নূতন কল্পনা করতঃ সহস্র প্রকার প্রাণির শত্রু হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তব পক্ষে বলিদান শব্দের এই অর্থ যে, বলি অর্থাৎ

নৈবেদ্য দান করা, যাহাতে সহস্র সহস্র দরিদ্রের উদর পূর্ত্তি হয়; নৈবেদ্য নিবেদনের সময় লোকে নিজের কামনা পূর্ণ হয় এইরূপ আশীর্বাদ প্রার্থণা করিয়া থাকে, পরন্তু অন্যের প্রাণ হিংসার জন্য নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেইরূপ না করিয়া ছাগল বলি দিয়া দেবদেবীর সন্তোষ সাধন করিতে চাহে, তাহার সেই কার্য্য প্রত্যক্ষ রূপে গর্হিত, তাহার সন্দেহ নাই।

বকৃরিদের দিন মুসলমানগণ অসংখ্য জীবের প্রাণ বৃথা নষ্ট করে। যদি খোদার নাম লইয়া মুসলমানদের কোন ধার্ম্মিক ফকিরকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে সে কহিবে যে তাহার শাস্ত্র-প্রমাণ জীবহিংসা অকর্ত্তব্য। যেহেতু খোদা যখন জগতস্থ সকল প্রাণির পিতা, তখন ছাগল, উট, গো, মহিষ প্রভৃতিরও তিনি পিতা। তবে পিতা হইয়া পুত্রের বিনাশ-সাধনে সন্তুট কেন হইবেন? যদি সন্তুট হন্, তবে তিনি পিতানামের যোগ্য নহেন। আর বিচারেও দেখা যায় যে, মুসলমানেরা একটী দন্তকাষ্ঠ অনেক দিন যাবৎ ব্যবহার করে, তাহার কারণ এই যে দন্তধাবনের নিমিত্ত দিন দিন নূতন নূতন বৃক্ষছেদন হইতে যতদূর সম্ভব নিবৃত্ত থাকা। কোরাণে কালের বিনাশসাধনের উল্লেখ আছে, কিন্তু আধুনিক মুসলমানেরা অনেকে কালের অর্থ সর্প, বৃশ্চিক, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি করিয়াছেন, তজ্জন্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ঐসকল জীবহত্যার জন্য প্রয়াস পায়; কিন্তু বাস্তবিক কালের অর্থ মহাত্মাগণ ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রাগ, দ্বেষাদিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল রিপুগণকেই বিনাশ করা উচিত। তাহারাই আত্মার প্রকৃত শত্রু, সর্পাদি

শত্রু নহে। সর্পাদি বিনাশ করিলে কালের বিনাশ হয় না। কেহ কেহ কহিয়া থাকে যে, মনুষ্য আপদ্‌শান্তির জন্য সর্পাদি বিষধরকে সংহার করে, তাহাদের ঐরূপ বাক্যও গ্রাহ্য নহে, কারণ যে স্থানে যত পরিমাণে বিষাক্ত জীবের ধ্বংস হয়, তথায় ততোধিক পরিমাণে তাহারা পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করে। গুজরাট্‌দেশের হিন্দুগণ প্রায় উহাদের মারে না, কেবল কোন কোন মুসলমানেরা মারিয়া থাকে, তজ্জন্য ঐ দেশে সর্পাদি জীবের সংখ্যা অধিক দেখা যায় না। যদি একেবারে উহাদের কেহ না মারিত, তবে গুজরাটে সর্পভয় নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইত। পূর্ব্বদেশ, বাঙ্গালা ও মগধ প্রভৃতি দেশের ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি জীবকে সংহার করিতে কিছু মাত্র পাপ অথবা অপবাদ মনে করেনা, তাহারা দেখিবা মাত্র ঐ সকল জীবকে মারিয়া ফেলে। সকল দেশেই মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল জীব ন্যূনাধিক বিনষ্ট হয়, কিন্তু সেই সকল দেশে গুজরাট্ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উহাদের প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়; তাহার কারণ এই যে, যেস্থানে বিনষ্ট জীবগণের রুধির পতিত হয়, সেই স্থানে তাহাদের সংখ্যা আরও অধিক বর্দ্ধিত হয়, এবং যে ব্যক্তি যে জীবের প্রাণ বিনাশ করে, মরণান্তে সে পুনরায় সেই জীবের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাহারই দ্বারা বিনষ্ট হয়। জীব একবার যে কর্ম্ম করে, পরিণামের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মবন্ধন হেতু তাহাকে সেই কর্ম্মফল দশ, শত, সহস্র, লক্ষ এমন কি কোটী গুণ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়। সর্পাদি বিনাশ করিলে স্বার্থ-সিদ্ধি অথবা পরোপকার কিছুই হয় না, পরন্তু পূর্ব্ব-কথিত

বাক্যানুসারে উভয়েরই অপকার সাধিত হয়। দেখুন্—যেখানে অল্প সংখ্যা সর্প থাকে, তাহাদের বিনাশ করিলে সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং বিনাশকারীকেও অবশ্য বিনষ্ট জীবের স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব কাল শব্দের অর্থ আত্মার শত্রু কাম ক্রোধাদি রিপুচয়কেই গণনা করিবে এবং উহাদের বিনাশ সাধনেই সম্যকরূপে উদ্যুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্যাবধি যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দয়াভাব অবলম্বনই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের মূল কারণ। জৈনধর্ম্মাবলম্বিদের পক্ষে এই দয়াভাব সিদ্ধ-সাধন রূপে নিয়তই প্রতিফলিত রহিয়াছে; কারণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যখন বর্ণিত হইয়াছে যে মহাত্মা পুরুষের প্রভাবে ক্রূর জন্তুগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং করিয়া থাকে, তখন সরল স্বভাব জীবের কথা কি আছে? যোগবাশিষ্ঠতে মোক্ষদ্বারে চারিটী দ্বারপালের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে "শম" একটী, এই শমতাগুণে পুরুষ সকল জীবের বিশ্বাসভাজন হয়। যথা—

"মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ" ॥ ৪৩ ॥
"মাতরীব পরং যান্তি বিষমাণি মৃদূনি চ।
বিশ্বাসমিহ ভূতানি সর্ব্বাণি শমশালিনি" ॥ ৬২ ॥

অর্থাৎ—মোক্ষদ্বারে শম, সদ্‌বিচার, সন্তোষ এবং সাধু-সমাগমরূপ চারিটী দ্বারপাল আছে, তন্মধ্যে শমকে প্রথম গণনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৬২ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে ক্রূর এবং শান্তস্বভাব বিশিষ্ট সকল প্রকার জীব শমভাবা

পায় মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ সেই প্রকার পুরুষ হইতে কোন জীবেরই ভয় হয় না, কারণ সে ব্যক্তি দয়ার আধার।

জীবহিংসা করিলে জীবের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা দেখুন্। যথা—

"শ্রূয়তে প্রাণিঘাতেন রৌদ্রধ্যানপরায়ণৌ।
সুভূমো ব্রহ্মদত্তশ্চ সপ্তমং নরকং গতৌ" ॥ ২৭ ॥

যোগশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রকাশ।

ভাবার্থ—শুনা যায় যে রৌদ্রধ্যান তৎপর সুভূম এবং ব্রহ্মদত্ত প্রাণিহিংসা করিয়া সপ্তম নরকে গমন করিয়াছিলেন। এইজন্য সম্পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া জীব হিংসা করা অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে খঞ্জ ও পঙ্গু হইয়া থাকা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। যথা—

"কুণির্ব্বরং বরং পঙ্গুরশরীরী বরং পুমান্।
অপি সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো ন তু হিংসাপরায়ণঃ" ॥ ২৮ ॥

যোগশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রকাশ।

উপরোক্ত শ্লোকের ভাবার্থ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে যদ্যপি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, রৌদ্রধ্যান যে হিংসা হইতে হয় তাহাই অকর্ত্তব্য, পরন্তু শান্তির জন্য কৃত হিংসা হইতে রৌদ্রধ্যান হয়না, অতএব সেরূপ হিংসা করিতে দোষ নাই। ইহার উত্তরে হেমচন্দ্রাচার্য্য কহিয়াছেন যে—

"হিংসা বিঘ্নায় জায়তে বিঘ্নশান্ত্যৈ কৃতাপি হি।
কুলাচারধিয়াপ্যেষা কৃতা কুলবিনাশিনী" ॥ ২৯ ॥

যোঃ শাঃ দ্বিঃ প্রকাশ।

ভাবার্থ—বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত যে হিংসা সাধিত হয়, সেই হিংসাই আবার বিঘ্নকারীর অবস্থায় পরিণত হয়। অর্থাৎ কুলপ্রথানুসারে যদি কেহ কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে জীব হিংসা করে, তবে সেই হিংসার জন্য তাহার কুশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেখুন্—পশুঘাতক কালসৌকরিকের পুত্র সুলস কৌলিক হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ সুখী হইয়াছিল। যথা—

"অপি বংশক্রমায়াতাং যস্তু হিংসাং পরিত্যজেৎ।
স শ্রেষ্ঠঃ সুলস ইব কালসৌকরিকাত্মজঃ" ॥ ৩০ ॥

যোঃ শাঃ দ্বিঃ প্রঃ।

যদাহ—

"অবি ইচ্ছন্তি য মরণং ন য পরপীড়ং কুণন্তি মণসা বি।
জে সুবিই অসুগইপহা সোয়রিঅসুও জহা সুলসো" ॥
॥ ১ ॥

যোঃ দ্বিঃ ২৬১।

তাৎপর্য্য—কুলক্রমাগত হিংসাও না করা উচিত; হিংসা ত্যাগ করিবার জন্য কালসৌকরিকের পুত্র সুলস শ্রেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রাকৃত গাথার ভাবার্থ—যে ব্যক্তি বরং আপনার মৃত্যু ইচ্ছা করে, পরন্তু আন্তরিক ইচ্ছার সহিত অপরকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা না করে, সে সৌকরিকপুত্র সুলসের ন্যায় সুচারুরূপে সদ্‌গতির মার্গ অবগত হয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত দৃষ্টান্ত যোগশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার মর্ম্ম বর্ণিত হইতেছে। যথা—

যখন সুলসের আত্মীয়গণ নানারূপ শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা তাহাকে হিংসাকার্য্যে নিয়োজিত করিল, এমন কি তাহারা তাহার হিংসাজনিত পাপেরও ভাগ লইতে স্বীকার করিল, তখন সুলস অগত্যা কুঠার লইয়া চলিল। কিন্তু সে স্বয়ং হিংসাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার এবং কুটুম্বগণের অন্তঃকরণে তদ্ভাব প্রতিবোধ করিবার ইচ্ছা করিয়া কুঠারখানি নিজের পায়েই আঘাত করিল। আঘাত লাগিয়া ক্ষতস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ সমংাস রুধির নির্গত হইতে লাগিল এবং সুলস উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। কুটুম্বগণ তাহার-আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেই স্থানে একত্র হইল এবং যথাযোগ্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিল, পরন্তু তাহাতে সুলসের বেদনার উপশম হইল না। তখন সুলস্ তাহাদের কহিল যে, তোমরা আমার এই বেদনার অংশ সকলে কিছু কিছু গ্রহণ কর। তাহার সেই কথা শুনিয়া এক বৃদ্ধ উত্তর করিল যে, কাহার বেদনার অংশ কি কেহ গ্রহণ করিতে পারে? সেই বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সুলস প্রত্যুত্তর করিল যে, তোমরা যখন প্রত্যক্ষ দুঃখের ভাগ লইতে পার না, তখন আমাকে হিংসাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া নরকাদি পরোক্ষ দুঃখের ভাগ লইতে কিজন্য বৃথা সাহস পাইতেছ? এইরূপ অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া নিরীহ সুলস পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত ছিল। শাস্ত্রকারগণ সুলসকে সেইজন্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন।

সুলসের ন্যায় যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিবে সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু শান্তির নিমিত্ত যে ব্যক্তি জীবহিংসা করে, তাহার ন্যায় জগতে মূর্খ আর কেহই নাই;

কারণ অপরকে অশান্তি প্রদান করিয়া যে নিজের শান্তি কামনা করে, তাহাকে বিচারশূন্য বিবেচনা করা উচিত। যখন কোন দেশে কোনরূপ অশান্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ধর্ম্মাত্মাপুরুষ সেই অশান্তি নিবারণের নিমিত্ত ঈশ্বর উপাসনা, দান, পূজা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু নাস্তিক ও নির্দয় মনুষ্যগণ জীব বলিদানের প্রয়াস পায় এবং নিরীহ ভদ্রলোকদেরও সেই অসৎপথের পথিক করে। যথা—

"বিশ্বস্তো মুগ্ধধীর্লোকঃ পাত্যতে নরকাবনৌ।
অহো! নৃশংসৈর্লোভান্ধৈর্হিংসাশাস্ত্রোপদেশকৈঃ" ॥

যোগশাস্ত্র দ্বিঃ প্রঃ।

ভাবার্থ—হিংসাশাস্ত্রের উপদেশক নির্দয় এবং লোভান্ধ মনুষ্যগণের দ্বারা প্রতারিত হইয়া বিচারকুশল বুদ্ধিমান ভদ্রলোকও নরকগামী হয়। অর্থাৎ যাহারা ঐ সকল নির্দয় মনুষ্যের অনুগত, তাহারা হিংসা ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া নরকগামী হয়। ঐরূপ কুপ্রথা গুজরাট্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশেও প্রচলিত আছে; তথাকার নির্দয় মনুষ্যগণ ছাগল আদি জীবহিংসা করিয়া অশান্তির অবস্থায় শান্তি ইচ্ছা করে, তজ্জন্য মহাশান্তস্বভাবের পক্ষপাতী হেমচন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ জীবদয়ার উপর প্রীতি স্থাপনের জন্য হিংসাশাস্ত্রের উপদেশকগণকে "নাস্তিকেভ্যোঽপি নাস্তিকাঃ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

"যে চক্রুঃ ক্রূরকর্ম্মানঃ শাস্ত্রং হিংসোপদেশকম্।
ক তে যাস্যন্তি নরকে নাস্তিকেভ্যোঽপি নাস্তিকাঃ" ॥

৩৭ ॥

ভাবার্থ—ক্রূরকর্ম্মা যে সকল মনুষ্য হিংসোপদেশক শাস্ত্র রচনা করিয়াছে, সেই অতিশয় ঘোর নাস্তিকগণ যে কোন্ নরকে গমন করিবে, তাহা বুঝা যায় না! ঐ সকল নাস্তিকব্যক্তি সরলপ্রকৃতির সাধারণ মনুষ্যদিগকে সহজে বশীভূত করিতে না পারিয়া আস্তিকের বেশ ধারণ করে, এবং তাহাদের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এরূপ বাক্যকৌশল প্রয়োগ করে, যদ্বারা তাহারা মুগ্ধ হইয়া অনর্থকারিনী হিংসা প্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

যে হিংসা করিলে হিংসাকারী কোনরূপে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, সেইরূপ হিংসা হইতে নরকপ্রাপ্তি হয় একথা হিংসোপদেশকগণ অবশ্যই স্বীকার করেন, তাহার কারণ এইরূপ অনুভব হয় যে, হিংসাধর্ম্মের উপদেশকগণ যখন বিচারকুশল সত্যবাদী মনুষ্যগণের নিকট যুক্তিদ্বারা বিচারে পরাস্ত হন্, তখন পাছে অনুগত ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাদের উপদেশ বাক্য প্রামাণিক এবং বিশ্বাসযোগ্য না হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা যজ্ঞ, মধুপর্ক, শ্রাদ্ধ এবং দেবীপূজা প্রভৃতিতে "জীবহিংসা করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি" ব্যবস্থা লিখিয়াছেন এবং সেই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে "জীবহিংসা হইতে নরকাদি দুঃখ ভোগ হয়" এ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণলোকে সেইজন্য তাঁহাদিগকে সত্যবাদী মনে করে এবং বলিয়া থাকে যে এই সকল সত্যবাদী মনুষ্য মনোভাব কিছুমাত্র গোপন রাখেন নাই। পরন্তু যদি তাঁহাদের বাক্যের উপর লোকের বিশ্বাস স্থাপন করাইবার অভিপ্রায় না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা হিংসাকে

পাপ বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

বর্ত্তমান সময়ে জীবদয়ার অনুবর্ত্তক মনুষ্যগণকে দেখিয়া যাজ্ঞিকগণ জীবহিংসার পুষ্টিসাধন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ করেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগের মৃগয়াদি হিংসাকে "দোষ" বলেন না, বরং "ধর্ম্ম" বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে ক্ষত্রিয়গণ মাংসাহার না করিলে কেমন করিয়া শত্রু জয়পূর্ব্বক দেশ রক্ষা করিবে? এইরূপ অনেক যুক্তি তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন বটে, কিন্তু সে সকল বুদ্ধিমানলোকের পক্ষে ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না। দেখুন্—কেবল রাজাদের প্রিয় হইবার অভিপ্রায়েই তাঁহারা মৃগয়াতে পাপ নাই বলিয়া থাকেন, যদি তাহা না হইত তবে ধার্ম্মিক রাজাগণ মৃগয়াতে কি জন্য আশক্ত ছিলেন না? আর বিচারেও দেখা যায় যে রাজার ধর্ম্ম এই যে তিনি নিরপরাধী প্রাণিগণকে রক্ষা করিবেন, কিন্তু বধ করিবেন না। সেইজন্য যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা নিরপরাধী জীবের প্রাণ বিনাশ করে, সেই সকল রাজার পুরুষার্থকে তিরস্কার করিয়া মহাত্মাগণ লিখিয়াছেন যে—

"রসাতলং যাতু যদত্র পৌরুষং
ক্ব নীতিরেষাশরণো হ্যদোষবান্।
নিহন্যতে যদ্ বালনাতিদুর্ব্বলো
হা হা! মহাকষ্টমরাজকং জগৎ" ॥ ১ ॥

"পদে পদে সন্তি ভটা রণোৎকটা
ন তেষু হিংসারস এষ পূর্য্যতে।
ধিগীদৃশং তে নৃপতে কুবিক্রমং
কৃপাশ্রয়ে যঃ কৃপণে মৃগে ময়ি" ॥ ২ ॥

ভাবার্থ—দুর্ব্বল জীবকে মারিয়া বলবানের যে পৌরুষ, তাহা রসাতলে যাউক্ এবং নিরপরাধী জীবের যদি কেহ রক্ষক না হয়, তবে তাহা নীতি বিরুদ্ধ ; বড় কষ্টের কথা যে নীতি বিনা সংসার অরাজক হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় শ্লোকে কবি রাজাগণকে অহিংসা ধর্ম্ম উপদেশ দিবার মানসে হরিণের পক্ষ লইয়া বলিতেছেন যে—হে ক্ষত্রিয়! যদ্যপি তোমার হৃদয়স্থ হিংসারস পূর্ণ করিতে বাসনা থাকে, তবে সংগ্রামে যে সকল ভয়ঙ্কর সৈন্যদল প্রস্তুত থাকে, তাহাদের দ্বারা কি তোমার সেই রস পূর্ণ হয় না ? অর্থাৎ যদি তুমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর তবেই তোমার শস্ত্রবর্ষণ সফল হইবে, কিন্তু তুমি কৃপার পাত্র এবং কৃপণ স্বভাব নিরীহ মৃগবধ করিয়া হিংসারস পূর্ণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, অতএব তোমার ঘৃণিত পরাক্রমে ধিক্।

বিবেচনা—উত্তমবংশীয় বীর্য্যবান রাজা যদি যুদ্ধার্থে সশস্ত্র সম্মুখীন হয়, তবেই ক্ষত্রিয় সেইরূপ সমযোগী যোদ্ধার সহিত ন্যায়ানুগত এবং শাস্ত্রোচিত যুদ্ধ নিষ্কপটে করিবে, ইহাই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম। যুদ্ধের এরূপ নিয়ম আছে যে পরাজিত যোদ্ধা যদি তৃণ মুখে লইয়া শরণাগত হয়, তবে জেতা তাহাকে ক্ষমা করিবে, কিন্তু তাহাকে বধ করিবে না। মৃগ সেই জন্য বলিতেছে যে, হে রাজন্! আমার শস্ত্র নাই এবং আমি শ্রেষ্ঠ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করি নাই, পরন্তু আমি নিরপরাধী জীব, সর্ব্বদা তৃণ মুখে রাখি, যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তবে তোমার কীর্ত্তি কিরূপ হইবে তাহা বিচার কর। কথিত আছে যে—

"বৈরিণোঽপি বিমুচ্যন্তে প্রাণান্তে তৃণভক্ষণাৎ।
তৃণাহারাঃ সদৈবৈতে হন্যন্তে পশবঃ কথম্" ॥ ২১ ॥
"বনে নিরপরাধানাং বায়ুতোয়তৃণাশিনাম্।
নিঘ্নন্ মৃগাণাং মাংসার্থী বিশিষ্যেত কথং শুনঃ" ॥ ২৩ ॥
"নির্মাতুং ক্রূরকর্মাণঃ ক্ষণিকামাত্মনো ধৃতিম্।
সমাপয়ন্তি সকলং জন্মান্যস্য শরীরিণঃ" ॥ ২৫ ॥
"দীর্য্যমাণঃ কুশেনাপি যঃ স্বাঙ্গে হন্ত! দূয়তে।
নির্মন্তূন্ স কথং জন্তূনন্তয়েন্নিশিতায়ুধৈঃ" ॥ ২৪ ॥

রাজাদিগের শিকার করা নিষিদ্ধ বিষয়ের এইরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত অসংখ্য শ্লোক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। আরও দেখুন্ যে ব্যক্তি মাংসের লোভপ্রযুক্ত কানন ও পর্ব্বতস্থিত নির্ঝর হইতে জল এবং তৃণভক্ষোপজীবী নিরপরাধী প্রাণি হিংসা করে, তাহাকে কুক্কুর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কারণ—

"সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি" ॥ ৪১ ॥
ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়।

ভাবার্থ—সমস্তবেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদিতে জীবের প্রতি অভয় দানের এক কলাও পূর্ণ করিতে পারে না। আরও লিখিত আছে যে—

"যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্" ॥ ১৪
ভাগবত ১১শস্কন্ধ ৫ম অধ্যায়।

ভাবার্থ—যে নিশ্চল-ভাবাপন্ন-অহিংসাধর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তি

আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া পশুগণের প্রতি দ্রোহাচরণ করে, সে ব্যক্তি জন্মান্তরে অবশ্যই সেই সকল পশু কর্ত্তৃক স্বয়ং ভক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও লিখিত হইয়াছে। যথা—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ" ॥ ৩২॥
অধ্যায় ৬ষ্ঠ।

ভাবার্থ—যে মহাত্মা সর্ব্বত্র নিজের ন্যায় অন্যের সুখ ও দুঃখ উপলব্ধি করেন, তিনিই পরম যোগী। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে—

"স্বচ্ছন্দং বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ" ॥

ভাবার্থ—যদি বনজাত শাকান্নের দ্বারা স্বচ্ছন্দে উদর পূর্ণ হয়, তবে দগ্ধ উদরের জন্য লোকে ঘোর পাপ কিজন্য করে? দেখুন—নিজের ক্ষণকালের তৃপ্তির জন্য ক্রূর মনুষ্যগণ যে অন্য জীবের জীবন হরণ করে, ইহা কি সুবুদ্ধির পরিচয়? যখন আপনার অঙ্গে সামান্য সূচীবিদ্ধ হইলে কত যন্ত্রণা অনুভব হয়, তখন তীক্ষ্ণশস্ত্রাঘাতে নিরপরাধী জীবের প্রাণ বিনাশ করা কি কর্ত্তব্য?

মাংসাহার সম্বন্ধে কবীর (১) প্রভৃতি মহাত্মাগণ কি লিখিয়াছেন, দেখুন—

---

(১) কবীরকে প্রামাণিক পুরুষ বলিয়া আমি মনে করিনা। "সত্য কবীরকা সাখী" নামে একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, সেখানিও ঠিক নয়। কবীরের গ্রন্থ অনেকস্থলে গ্রাম্যভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহা হইতে শাস্ত্রীয়

"মাঁস অহারী মানই, প্রত্যক্ষ রাক্ষস জান।
তাকী সঙ্গতি মতি করৈ, হোই ভক্তি মে হানি" ॥ ১ ॥

"মাঁস খাঁয় তে ডেঢ় সব, মদ্যপীবৈ সো নীচ।
কুল কী দুর্ম্মতি পর হরৈ, রাম কহৈ সো উঁচ" ॥ ২ ॥

"মাঁস মছলিয়া খাত হৈঁ, সুরাপান সে হেত।
তে নর নরকে জাহিঙ্গে, মাতা পিতা সমেত" ॥ ৩ ॥

"মাঁস মাঁস সব এক হৈ, মুরগী হিরণী গায়।
আঁখি দেখি নর খাত হৈ, তে নর নরকহিঁ জায়" ॥ ৬ ॥

"যহ কুকর কো ভক্ষ হৈ, মনুষ্য দেহ কোঁ খায়।
মুখমে আমিষ মেলিকে, নরক পরন্তে জায়" ॥ ৭ ॥

"ব্রাহ্মণ রাজা বরণ কা, ঔর পবনী ছত্তিস।
রোটী উপর মাছলী, সব বরণ ভয়ে খবীস" ॥ ৮ ॥

"কলিযুগ কেরা ব্রাহ্মণা, মাঁস মছলিয়া খায়।
পাঁয় লগে সুখ মানই, রাম কহে জরি জায়" ॥৯॥

"তিলভর মছলি খায় কে, কোটি গঊ দৈ দান।
কাশী করবট লৈ মরৈ, তৌ ভী নরক নিদান" ॥১৬॥

"বকরী পাতী খাত হৈ, তাকী কাঢ়ী খাল।
জো বকরী কো খাত হৈঁ, তিনকা কৌন হবাল" ॥১৮॥

"কবিরা তেই পীর হৈঁ, জো জানৈ পর পীর।
জো পর পীর ন জানিহৈ, সো কাফর বেপীর" ॥৩৬॥

জ্ঞান অনুভব হয়না। কোথাও বা কবীরের রচনাতে রাগ, দ্বেষপূর্ণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, "সাখী" পুস্তকের শেষভাগে "দর্শননিন্দাপরক" প্রবন্ধে ঐরূপ ভাবের উপলব্ধি হয়। তথাপি কবীরের কবিতা রচনা দয়াদি সামান্য গুণের পুষ্টিসাধন বিষয়ে প্রসস্ত বলিয়া সাধারণতঃ গ্রাহ্য, সুতরাং আমি এস্থলে উহার উল্লেখ করিলাম।

"হিন্দু কে দয়া নহিঁ, মিহর তুরক কে নাহিঁ।
কহে কবীর দোনূঁ গয়া, লখ চৌরাসী মাঁহিঁ ॥৩৯॥
মুসলমান মারে করদ সো, হিন্দু মারে তরবার।
কহে কবীর দোনঁ মিলি, জৈহিঁ যম কে দ্বার" ॥৪০॥

কবীরের কথা অনুসারে শিকার প্রভৃতি সমস্ত হিংসা কার্য্য নিষিদ্ধ ও অকর্ত্তব্য।

দর্শনশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ব্যসন সাত প্রকার, তন্মধ্যে মৃগয়া একটী, যথা—

"দ্যূতঞ্চ মাংসঞ্চ সুরাঞ্চ বেশ্যা পাপর্দ্ধিচৌর্য্য পরদারসেবা।
এতানি সপ্ত ব্যসনানি লোকে ঘোরাতিঘোরং নরকং নয়ন্তি"॥

ভাবার্থ—দ্যূতক্রীড়া, মাংসাহার, মদ্যপান, বেশ্যাগমন, মৃগয়া, চৌর্য্য এবং পরদারগমন এই সাত প্রকার ব্যসন হইতে মনুষ্যগণ অতি ঘোর নরকগতি প্রাপ্ত হয়।

বিবেচনা—পাপর্দ্ধি, মৃগয়া এ সকল শিকারের নামান্তর। নাম হইতে ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে যাহাতে পাপ কার্য্যের ঋদ্ধি হয় তাহাই পাপর্দ্ধি, এবং ব্যসন শব্দে শিকারাদি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কার্য্য। ব্যসন শব্দের অর্থ এরূপ দোষাবহ হইলেও শিকার কার্য্যকে যাঁহারা রাজার ধর্ম্ম বলিয়া মানেন, তাঁহাদিগকে লোকে যে কি কারণে কোন অংশে তত্ত্বজ্ঞানী বলে তাহা বুঝা যায় না। যদি কেহ একথা বলিতে সাহস করেন যে, যাহারা শিকার করে তাহারা শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ বলিয়া তাহাদের দ্বারা দেশ রক্ষার বিশেষ সাহায্য হয়। তাহার উত্তর এই যে, অন্য জীবের অমঙ্গল বিধান করিয়া নিজের মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করা কি মনুষ্যোচিত কার্য্য? কখনই

নহে। পূর্ব্বকালে মনুষ্যগণ লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে কি জীব হিংসা করিত? সে সময়ে মনুষ্যগণ বিদ্ধ বিষয়ে দক্ষ হইবার জন্য নিম্বুর ন্যায় কোন একটি ক্ষুদ্র পদার্থ উচ্চ স্থানে রাখিয়া দিত, এবং দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বান অথবা গুলির দ্বারা বিদ্ধ করিত। যখন সেইরূপ স্থির এবং নিশ্চল পদার্থের লক্ষ্য বিদ্ধ করাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে কুশলতা লাভ করিত, তখন অস্থির এবং চঞ্চল পদার্থ বিদ্ধ করিবার জন্য শুষ্ক লঙ্কার ন্যায় কোন হাল্‌কা পদার্থ রজ্জুবদ্ধ করিয়া উচ্চ স্থানে অথবা বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিত, এবং বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইতে থাকিলে উহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্ধ করিত। এইরূপ নিয়মে তাহারা স্থির ও অস্থির পদার্থের লক্ষ্যবিদ্ধ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া হিংসাজনিত পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজগণও কোনরূপ অপ্রাকৃত পদার্থ নিম্মাণ করাইয়া ঘোড়দৌড় শিক্ষা করেন এবং লক্ষ্যভেদ অভ্যাসের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ কোন দ্রব্য রাখিয়া তাহারই উপর গুলি বর্ষণ করেন। অতএব শিক্ষার জন্য বহুবিধ উপায় থাকিতে মৃগয়াদি কষ্টসাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্য জীবের দুঃখোৎপাদন করা সুবুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। যদ্যপি রাজাগণকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে শিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে সে বিষয়ে আমার বক্তব্য কিছুই নাই, কারণ কোন কোন সময়ে দাক্ষিণ্যের দ্বারা দুর্জ্জনতার কার্য্য সাধিত হয়, পরন্তু স্বার্থান্ধতা হইতে অনর্থই উৎপন্ন হয়। "শিকার করিতে দোষ নাই" এবং "শিকার রাজাদিগের ভূষণ" ইত্যাদি বাক্য

স্বার্থান্ধতা এবং দাক্ষিণ্য হইতেই কথিত হইয়া থাকে।

সুশ্রুতে লিখিত আছে—

"পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো রস্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদস্রপিত্তং তু কুষ্ঠরোগং করোত্যসৌ" ॥৮॥

ভাবার্থ—মৎস্য শ্লেষ্মাকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মাংস খাদক এবং উহা অস্রপিত্তকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন করে।

দর্শন-শাস্ত্র-প্রণেতাগণের মতের বিভিন্নতা অনুসারে আত্মতত্ত্ব অবগতির মার্গ নানারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং যাবৎ হিংসাবিষয়ে মতভেদ দৃষ্টিগোচর হইবে, তাবৎ অহিংসা ধর্ম্মের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। অতএব তৎসম্বন্ধে কেবল অল্পমাত্র লিখিয়া আমি এই নির্ব্বন্ধ সমাপ্ত করিতেছি। কোন কোন দর্শন-শাস্ত্র-প্রণেতা আত্মা এবং দেহকে একান্ত রীতিতে পৃথক্ বলিয়াছেন, তাঁহাদের মতানুসারে দেহকে কর্ত্তন ও ভেদ করিলে হিংসা করা হয় না। এবং যাঁহারা দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া থাকেন, সেই সকল মহাত্মার সিদ্ধান্ত অনুসারে হিংসাভাব ও পরলোক সিদ্ধ হয় না; কারণ দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মার বিনাশ হইবে, সুতরাং যখন আত্মা ঘটাত্মা, পটাত্মা ইত্যাদি রূপে অনিত্য হইল, তখন ঘট, পট নষ্ট হইলে যেরূপ হিংসা সাধিত হয় না, সেইরূপ অনিত্য আত্মার বিনাশ হইলে হিংসাও সাধিত হইবে না এবং কেহ পরলোকেরও ভাগী হইবে না; পরলোকভাগী যদি কেহ না হয়, তবে পরলোকের অভাব ইহাতে সিদ্ধ হইল। অতএব ভিন্ন এবং অভিন্নভাবে জীবাত্মা দেহে অবস্থান করেন

এইরূপ কথঞ্চিৎ যুক্তি স্বীকার করিতে হইবে; অর্থাৎ আত্মা শরীর হইতে "কোন২ অংশে ভিন্ন এবং কোন২ অংশে অভিন্ন" যদি যুক্তিদ্বারা এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শরীর বিনষ্ট হইবার সময় যে পীড়া সমুৎপন্ন হয় তাহা-কেই হিংসা বলিতে হইবে; এবং শরীর নষ্ট হইলে আত্মা অন্যগতি প্রাপ্ত করায় বলিয়া পরলোকও মানিতে হইবে। তত্ত্ববেত্তাগণ হিংসার স্বরূপ নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"দুঃখোৎপত্তির্মনঃক্লেশস্তৎপর্যায়স্য চ ক্ষয়ঃ।
যস্যাং স্যাৎ সা প্রযত্নেন হিংসা হেয়া বিপশ্চিতা"॥

ভাবার্থ—যাহাতে দুঃখের উৎপত্তি, চিত্তের ক্লেশ এবং শরীরের পর্য্যায় ক্ষয় হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইরূপ হিংসাকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। বিষয়, কষায়, নিদ্রা, মাদক দ্রব্য পান, বিকথাদিরূপ প্রমাদ হইতে দুঃখোৎপত্তি, মনঃক্লেশ এবং জীবের আধার স্বরূপ শরীরের বিনাশসাধনকেই হিংসা বলে। এই হিংসারূপ অমোঘ বীজ হইতে সংসাররূপ বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যদি এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে যোগী ও ভোগী উভয়েরই গমনাগমনাদি-রূপ কার্য্য হইতে অবশ্যই যখন হিংসার উৎপত্তি হয়, তখন সংসাররূপ বৃক্ষের নাশ কেমন করিয়া সম্ভব? ইহার উত্তর এই যে, প্রমাদী (অজ্ঞানী) পুরুষ বিনা উপযোগে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই কার্য্যের দ্বারা জীবহিংসা হউক বা না হউক সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু হিংসার জন্য যে পাপ, তাহা সেই প্রমাদীকে অবশ্যই আক্রমণ করিবে; পরন্তু অপ্রমাদী পুরুষ উপযোগ পূর্ব্বক

গমনাগমন ক্রিয়া করেন, যদি তাহাতে কোন জীব নষ্ট হয়, তবে হিংসাজনিত পাপ তাঁহাকে আক্রমণ করিবে না, ইহা শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়াছেন ; কারণ পরিণাম অনুসারে পাপের দণ্ড হইয়া থাকে। রাজকীয় নিয়মও এই রীতি অনু-সারে চালিত হয়, অর্থাৎ কেহ কাহাকে মারিবার উদ্যোগ করিলে রাজদণ্ডে তাহার ফাঁসী হইয়া থাকে এবং মারিবার চেষ্টা না করিয়া যদি কাহার দ্বারা কোনব্যক্তি কোনরূপে হত হয়, তবে তাহার ফাঁসী না হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্ত করিবার আদেশ হয়। অনেকে হত্যা না করিয়া কেবল উদ্যোগী হইবার কারণ দোষী প্রমাণিত হইয়া দণ্ডিত হইয়া থাকে। সেইরূপ যদি প্রমাদীব্যক্তি হস্ত বা পদের দ্বারা না জানিয়া কোন জীবহত্যা করে, তবে তাহার পরিণাম শুদ্ধ নয় বলিয়া তাহাকে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, এবং অপ্রমাদী ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, তথাপি অনবধানতা-প্রযুক্ত কর্ম্মযোগে যদি কোন জীব তাহার দ্বারা কখন হত হয়, তবে তাহাকে পাপ স্পর্শ করিবে না, তত্ত্ববেত্তাগণের অভিপ্রায় এইরূপ। দশবৈকালিকের সূত্রে শিষ্য গুরুকে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছে যে—

"কহং চরে কহং চিট্ঠে কহমাসে কহং সএ।
কহং ভুঞ্জন্তো ভাসন্তো পাবং কম্মং ন বন্ধই" ॥

ভাবার্থ—কিভাবে চলিলে, কিভাবে দাঁড়াইলে, কি ভাবে বসিলে, কিভাবে শুইলে, কিভাবে খাইলে এবং কিরূপ কথা কহিলে আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে না ?

আচার্য্য উত্তর করিলেন যে—

"জয়ং চরে জয়ং চিট্টে জয়মাসে জয়ং সএ।
জয়ং ভুঞ্জন্তো ভাসন্তো পাবং কম্মং ন বন্ধই"॥

ভাবার্থ—যত্নপূর্ব্বক চলিবে, যত্নপূর্ব্বক দাঁড়াইবে, যত্নপূর্ব্বক বসিবে, যত্নপূর্ব্বক শুইবে, যত্নপূর্ব্বক খাইবে এবং যত্নপূর্ব্বক কথা কহিবে, তাহা হইলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিবে না। অর্থাৎ উপযোগ পূর্ব্বক কার্য্য করিলে মনুষ্য হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হয় না। অতএব যোগী এবং ভোগীর বিষয়ে প্রশ্নকাঙ্ক্ষী পূর্ব্বোক্ত উপদেশ বাক্যানুসারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন। কিন্তু একান্তরূপে আত্মাকে যাঁহারা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, এবং একান্ত পক্ষে যাঁহারা আত্মাকে অনিত্য বলেন, তাঁহাদের দুই পক্ষতেই "হিংসা" শব্দের ব্যবহার হইতে পারে না। কারণ একান্ত আত্মার নিত্যতা স্বীকার করিলে আত্মা অবিনাশী অর্থাৎ উহার নাশ নাই এইরূপ সিদ্ধ হইবে; এবং অনিত্য বলিলে আত্মা প্রতিক্ষণ বিনাশী বলিয়া উহা স্বয়ং নষ্ট হয় অতএব উহার নাশ্য-নাশকভাব সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং হিংসা কাহার হইবে? যেখানে হিংসা শব্দের প্রয়োগ নাই, সেখানে অহিংসাধর্ম্মের মহিমা খরশৃঙ্গের ন্যায় অসৎকল্পনারূপে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব "স্যাদ্‌বাদ্‌" মতানুসারে আত্মার কথঞ্চিৎ নিত্যানিত্য-ভাব স্বীকার করিতেই হইবে, তাহা হইলে পরিণামী আত্মার উৎপাদ্‌ ব্যয় হইলেও কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা থাকিবে না। এবং উৎপাদ্‌ ব্যয় হইলেও পদার্থের মূলস্বরূপ তদ্‌ভাবা-ব্যয়রূপ যে নিত্যত্ব উহা স্থির থাকিবে। নিত্যৈকান্তবাদী নিত্যত্বের লক্ষণ "অপ্রচ্যুতানুৎপন্নস্থিরৈকরূপং নিত্যম্‌" এইরূপ

কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ—যে কথনও পতনশীল নহে এবং উৎপন্ন হয় না, এইরূপ স্থির পদার্থই নিত্য পদার্থ। কিন্তু সংসারী জীবের ঐরূপ লক্ষণ সম্ভবপর নহে, কারণ জন্ম মরণাদি কার্য্য আত্মার জীবপরত্বতেই উপলব্ধি হয়। একান্ত অনিত্যবাদির পক্ষতেও অনিত্যের লক্ষণ "তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংস-প্রতিযোগিত্বং ক্ষণিকত্বং" এই প্রকার উল্লেখ আছে, অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে সকল পদার্থের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস হয়; যাঁহারা এইরূপ মানেন, তাঁহাদের মতে সাংসারিক ব্যবহার সুব্যবস্থিত থাকিতে পারে না, কারণ পর্য্যায়ার্থিকনয়ের অপেক্ষায় আত্মাকে মনুষ্য, তির্য্যগ্ প্রভৃতি বহুবিধ পর্য্যায়ের অনুভব করিতে হয়, অতএব এ অবস্থায় আত্মা অনিত্য হইল। দ্রব্যার্থিকনয়ের অপেক্ষায় আত্মা—অচ্ছেদী, অভেদী, অবিনাশী, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অবিকারী, অসংখ্যপ্রদেশাত্মক এবং সচ্চিদানন্দময় পদার্থ; এবম্বিধ আত্মাকে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করাকেই হিংসা করা বলে। আত্মাতে যুক্তিপূর্ব্বক নিত্যানিত্যভাব স্বীকার করিলেই হিংসাভাব সিদ্ধ হইবে। সুতরাং হিংসাত্যাগের কার্য্যকে অহিংসা ধর্ম্ম বলিতে হইবে। বিপরীত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ কুতর্কের অধীন হইয়া বলেন যে, হিংস্রক প্রাণিগণকে হত্যা করিলে পাপ হয় না, যে হেতু একটী হিংস্রক জন্তু মরিলে অনেক নিরীহ জীবের প্রাণ রক্ষা হয়। এরূপ মনে করা তাহাদের ভ্রম, কারণ পৃথিবীতে সকল প্রাণিকেই পরস্পর কোন না কোন অংশে হিংসা করিতে দেখা যায়, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে সকল জীবকেই মারিবার অবসর

দেওয়া হয়, তাহা হইলে লাভের পরিবর্ত্তে হানি অধিক হয়। অতএব হিংস্রক জন্তুগণকে বধ করিয়া ধর্ম্ম মনে করা অনুচিত। হিংস্রক অথবা অহিংস্রক সকল প্রকার জীবকে ভয়মুক্ত করিলেই পরম ধর্ম্ম হয়, যেহেতু পরিণাম হইতে বন্ধ এবং ক্রিয়ার দ্বারা কর্ম্ম হয় ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

চার্ব্বাকের মতানুসারে কেহ কেহ সংসার মোচনের উপায় এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, ক্লিষ্ট জীবগণকে বধ করিয়া তাহাদের ক্লেশ বিমোচন করিলে পরম ধর্ম্ম হয়। যাঁহারা স্থূল দৃষ্টিতে ঐরূপ যুক্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া মানেন, তাঁহারা সামান্য সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলে আর কদাচ মহাভ্রমে পতিত হইবেন না। জীবের হাত পা ভাঙ্গিয়া গেলে অথবা জীব জ্বরাদির যাতনায় বিহ্বল হইলে, সেই যাতনার অন্ত করতঃ তাহাকে সুখী করিবার অভিপ্রায়ে কোন২ লোকে গুলি করিয়া তাহার জীবনান্ত করে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ প্রকার কার্য্যে অল্প যাতনার পরিবর্ত্তে তাহাকে অধিক যাতনাভোগ করিতে হয়। কারণ জ্বরাদির যাতনা অপেক্ষা গুলির যাতনা যে সে অধিক ভোগ করে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, এবং সে ইহ-সংসারে অল্পমাত্র যাতনা ভোগ করিতেছিল, পরন্তু দেহা-বসানে পরলোকে গর্ভাদিরূপ অনন্ত যাতনা ভোগ করিবে। সেইজন্য জীব "আর্ত্তরৌদ্রধ্যান" পরায়ণ হইলে নরকাদি গতির ভাগী হয়। অতএব যন্ত্রণার অন্ত করিবার মানসে জীবকে গুলি করিয়া হত্যা করা লোকের ভ্রম মাত্র। যদি ঐরূপ ধর্ম্মকে কেহ সত্য বলিয়া মনে করে, তবে যে প্রকারে পশু-গণের যাতনা দূর করিতে অভিলাষ করে, সেই প্রকারে সে

আপনার পিতা মাতার যন্ত্রণা দেখিয়া তাহাদের যাতনা দূর কেন না করে? যে হেতু মনুষ্যের সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দুঃখী প্রাণিগণকে মারিলে যদি ধর্ম্ম হয়, তবে সুখী জীবদের সংহার করিয়া সংসার বর্দ্ধক পাপ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা উচিত! চার্ব্বাকের সিদ্ধান্তবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নানা-বিধ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব কুযুক্তিরূপ অসদাশয়ের মার্গানুসরণ না করিয়া সংসারমোচনের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করাই মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য।

নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক্ বলেন যে—যখন আত্মারূপ পদার্থের অস্তিত্ব নাই, তখন হিংসা কাহার হইবে? তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিব্যাদি ভৌতিক পদার্থ হইতে চলনাদি সকল কার্য্যই উৎপন্ন হয়; যেমন গুড়, আটা প্রভৃতি দ্রব্য হইতে ভাড়ী, এক বিচিত্র মাদকশক্তি "তাড়িতে" উৎপন্ন হয়। ঐ শক্তির নিবৃত্তিভাবকে লোকে মৃত্যু কল্পনা করিয়া থাকে; পরন্তু মরণান্তে কোন জীব পরলোকে গমন করে না, কারণ আত্মারই যখন সত্বা নাই, তখন পরলোক প্রাপ্তি কোথা হইতে হইবে? এবং পরলোকের কারণ পুণ্য ও পাপ যদি সিদ্ধ না হইল, তবে পুণ্য ও পাপের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কেমন করিয়া সিদ্ধ হইবে? ধর্ম্মাধর্ম্ম যদ্যপি না থাকিল, তবে তপস্যা, জপ, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান ইত্যাদি কার্য্য সকলই বিড়ম্বনা মাত্র। এই সকল কুতর্কের উত্তরে চার্ব্বাকের বুঝা উচিত যে চার্ব্বাক পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকল যখন উদ্ভাবন করে, তখন কোন পদার্থের সাহায্যে সে ঐ গুলি করিয়াছিল কি না? যদি করিয়া থাকে, তবে সে পদার্থ জড়রূপ অথবা জ্ঞানরূপ?

যদি জড়রূপ হয়, তবে জড়পদার্থের, আস্তিককে নাস্তিক করে, এরূপ শক্তি কোথায় ? তবে যদি জ্ঞানরূপ বলা যায়, তাহা হইলে জড় হইতে অতিরিক্ত পদার্থ সিদ্ধ হইবে, কারণ চার কিম্বা পাঁচ ভূতের শক্তি দ্বারা জ্ঞান শক্তির উদ্ভব হয় এইরূপ বলিলে উপরোক্ত "তাড়ীর" দৃষ্টান্ত বিসম হইবে, কারণ পঞ্চভৌতিক "তাড়ীতে" মাদকশক্তি আছে, পরন্তু পৃথিব্যাদি পদার্থে জ্ঞান-গুণ নাই। অতএব পঞ্চভূতোৎপন্ন শক্তি হইতে জ্ঞানগুণের উদ্ভাবন সিদ্ধ হইতে পারে না। যে শক্তি তোমাতে এবং আমাতে আছে, তাহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় এবং অন্য জীবে যে শক্তি আছে, তাহাও অন্য প্রকার দৃষ্টিগোচর হয়, তজ্জন্য সেই শক্তিকে পঞ্চভৌতিক শক্তি হইতে স্বতন্ত্র এবং কর্ম্মাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু ভিন্ন ২ কর্ম্ম করিয়া জীবকে ভিন্ন ২ প্রকৃতি লাভ করিতে দেখা যায়। আস্তিকগণ সেই শক্তিকে আত্মা শব্দে অভিহিত করেন। পরন্তু চার্ব্বাকের মতানুসারি-গণকে প্রকারান্তরে যদ্যপি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তোমরা নাস্তিক মতকে দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল হেতু দেখাইতেছ, সে গুলি প্রামাণিক অথবা অপ্রামাণিক ? অবশ্য তোমরা অপ্রামাণিক বলিবে না, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত কর্ত্তব্যকার্য্য অপ্রামাণিক হইবে ; তবে প্রামাণিক বলিলে এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, তোমাদের ঐ প্রমাণগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ? পরলোকাদি স্বীকার করিবার ভয়ে তোমরা পরোক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিবে না; এক্ষণে থাকিল "প্রত্যক্ষ" প্রমাণ। কারণ "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ"

যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর, তবে তোমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রমাণীভূত কিনা, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন হইবে। যদি "প্রত্যক্ষ প্রমাণ" প্রমাণীভূত স্বীকার্য্য হয়, তবে কিরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণীভূত হইল ? তাহাতে যদি বল যে "প্রত্যক্ষ" হইতে, তবে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা হইবে যে, সেই "প্রত্যক্ষ" প্রমাণীভূত কি না ? এইরূপ অনবস্থাদোষ ক্রমশঃ আসিবে। তজ্জন্য "প্রত্যক্ষ" প্রমাণকে স্বীকার করিবার জন্য "অনুমানের" আবশ্যক ; যেমন—"প্রত্যক্ষং প্রমাণম্ অব্যভিচারিত্বাৎ, যদব্যভিচারি তৎপ্রমাণম্, যথা ঘটজ্ঞানম্"-ইত্যাদি। প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে উক্তরূপ অনুমানের আধার যে সকল বচন আছে, সেই গুলিকে গ্রাহ্য করিতে হইবে। অতএব "অনুমান" যখন অনায়াসসিদ্ধ হইল, তখন আত্মার অস্তিত্বও সিদ্ধ হইবে, কারণ—"অস্তি খলু আত্মা সুখদুঃখাদি সম্বেদনত্বাৎ, যঃ সুখদুঃখাদিসম্বেদনবান্ স আত্মা, যথা অস্মদাত্মাত্মা" ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা স্বদেহে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হইলে, পরদেহাদিতেও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। আত্মার সিদ্ধি হইলে পরলোক সিদ্ধি স্বভাবতঃই হইবে এবং পাপ পুণ্য হইতে পরলোকের সিদ্ধি হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মও সিদ্ধ হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্তাবস্থায় তপ, জপ, জ্ঞান, ধ্যানাদি সকল ক্রিয়াই সিদ্ধ হইবে। তখন যাঁহারা জপাদি কার্য্যকে নিষ্ফল বলেন, তাঁহাদিগকে বিচারশূন্য বলা আবশ্যক। অতএব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, অহিংসা ধর্ম্মের বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। এই

সংসারে নানারূপ কল্পিত মতের প্রচলন সংঘটিত হইয়াছে। যে সকল নিরীহ ভদ্রলোক সেইরূপ মতজালে মৎসগণের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান, করে, তাহাদের কষ্টের পরিসীমা নাই। যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি উক্ত নিরীহ লোকদিগের অন্তঃকরণে দয়াভাব আনিয়া তাহাদিগকে শুভমার্গের অনুবর্ত্তী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাঁহারাই যথার্থ পারমার্থিক পরোপকারী।

দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণকে যাঁহারা আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, বাস্তবিক তাঁহারা চার্ব্বাকের মতানুসারী, কারণ দেহকে যাঁহারা আত্মা বলেন যদি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে, মৃত্যু হইলে দেহের কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, কিন্তু জীবিতাবস্থায় দেহতে যে চেষ্টা থাকে তাহা তখন কিজন্য দেখা যায় না? তাহার উত্তরে যদি তাঁহারা এইরূপ বলেন যে তদবস্থায় কোন এক শক্তির উহাতে অভাব হইয়া যায়, তখন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, সেই শক্তি দেহ হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? অভিন্ন পক্ষের আশ্রয়গ্রহণ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে মৃতাবস্থায় সেই শক্তির শরীরে থাকা আবশ্যক; তবে ভিন্ন বলিলে, উহা চিদ্রূপ কিম্বা জড়রূপ, তাহা জিজ্ঞাস্য হইবে। জড়রূপ স্বীকার করিলে, "অহং সুখী, অহং দুঃখী" ইত্যাদি প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) অভাব হইবে। আর যদি চৈতন্যরূপ স্বীকার করেন, তাহা হইলে শব্দান্তরে দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন ইহাই সিদ্ধ হইবে।

এক্ষণে ইন্দ্রিয়গণকে যাঁহারা আত্মা বলেন, তাঁহাদেরও ভ্রম দূর করা যাইতেছে। ইন্দ্রিয়গণকে যাঁহারা আত্মা বলেন,

তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়গণের সামুদায়িক জ্ঞানের অভাব হওয়া উচিত। অর্থাৎ আমি শুনিয়াছি, আমি দেখিয়াছি, আমি স্পর্শ করিয়াছি—ইত্যাদি সামুদায়িক প্রতীতি যাহা আবাল বৃদ্ধ সকলেরই হয়, তাহা আর হইবে না ; কারণ যে শ্রবণ করিল সে তো শ্রবণেন্দ্রিয়, যে দেখিল সে তো দর্শনেন্দ্রিয়, যে আঘ্রাণ লইল সে তো ঘ্রাণেন্দ্রিয়, যে রসাস্বাদন করিল সে তো রসনেন্দ্রিয় এবং যে স্পর্শ করিল সে তো স্পর্শেন্দ্রিয় ; এক্ষণে তুমি যদ্যপি ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বল, তাহা হইলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেরূপ না হইয়া সামুদায়িক জ্ঞান হয়। অতএব ইন্দ্রিয়গণের অধিনায়ক আত্মাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যদি তাহা স্বীকার না করা যায়, তবে মৃতদেহে ইন্দ্রিয়গণ বিনষ্ট হয় না, কেবল জ্ঞানেরই অভাব হয়; তদবস্থায় উহার কারণ আত্মারই অভাব স্বীকার করিতে হইবে। আত্মা শরীর এবং ইন্দ্রিয়গণকে ছাড়িয়া অন্যগতি প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য আত্মাকে ইন্দ্রিয় বলা যায় না, পরন্তু উহা ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ।

বাস্তবিক আত্মা নিত্য পদার্থ হইলেও কর্ম্মজনিত জন্ম মরণাদির অপেক্ষায় অনিত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। জৈনশাস্ত্রকারগণ দ্রব্যমাত্রকেই উৎপাদ স্থিতি ও ব্যয়াত্মক স্বীকার করেন। আত্মাকে সচ্চিদানন্দময় পদার্থ বলিলে স্থিতি, উৎপাদ্ ব্যয় শব্দাত্মক স্বীকার করা হইল। স্থিতি বলিলে দ্রব্যার্থিক নয়ের অপেক্ষায় আত্মা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ইত্যাদি প্রমাণিত হইল ; এবং উৎপাদ্ ব্যয় জন্ম মরণাদিরূপ কার্য্য-কারণ ভাবের বিকাশ হয় বলিয়া আত্মা

পর্য্যায়ার্থিক-নয় স্বীকৃত হইল। তত্ত্ববেত্তাগণ অনাদিকাল প্রচলিত ব্যবহারানুসারে আত্মাকে জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা, কর্ত্তা এবং কায়পরিমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু বাস্তবিক উহাতে কায়পরিমাণত্ব নাই, উহার কোন রূপ নাই। রূপ-বিশিষ্ট পদার্থেরই পরিমাণ সম্ভব হয়। আকাশের বাস্তবিক কোন পরিমাণ নাই, কিন্তু ঔপচারিকত্বকেই পরিমাণ স্বীকার করা হয়। সেইরূপ আত্মারও পরিমাণ নাই, পরন্তু কর্ম্মরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া আত্মাকে শরীরী বলা হইয়া থাকে। অথবা আত্মাকে যে কায়পরিমাণ বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যদি ব্যাপক পরিমাণ স্বীকার করা যায়, তবে অনেক বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ ব্যাপক হইলে ঘট, পটাদির নাশ হইলে আত্মার সুখ দুঃখ অনুভব হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা হয় না। ইহার উত্তর এই যে, "শরীর থাকিলেই জ্ঞান থাকে" এইরূপ স্বীকার করা; "শরীরাবচ্ছেদেন জ্ঞানমুৎপদ্যতে"। কিন্তু একথাও ঠিক্ নহে, কারণ মোক্ষাবস্থায় শরীর থাকে না, তখন জ্ঞান না থাকা আবশ্যক; এবং মৃতাবস্থায় শরীর থাকে, তখন জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইহার উত্তরে যদি কখন এরূপ বলা যায় যে, কি মৃতাবস্থায় আত্মা থাকে না? আত্মা যখন ব্যাপক পরিমাণ বলিয়া সর্ব্বত্র আছে, তখন মৃত শরীরে কেন না থাকিবে? মোক্ষাবস্থায় জ্ঞান থাকে কি না? থাকে, পরন্তু উহা ইষ্টরূপে থাকে। আচ্ছা! তবে কি কর্ম্মফল ছাড়িয়া মুক্তিগামী জীব অজ্ঞানের ভাগী হয়? মুক্তিতে যদি জ্ঞানাদির স্বীকার না করা যায়, তবে পাষাণ এবং মুক্তাত্মার

কি প্রভেদ থাকিল? আত্মাকে ব্যাপক স্বীকার করিলে এইরূপ অনেক আপত্তির উদ্ভাবন হয়। সেইজন্য আত্মাকে ঔপচারিক কায়পরিমাণ স্বীকার করা উচিত। ঐরূপ আত্মাকে দুঃখিত অথবা ক্লেশযুক্ত এবং প্রাণমুক্ত করিলেই হিংসা করা হয়। সেই হিংসা ত্যাগরূপ অহিংসাধর্ম্ম প্রাণিগণের পক্ষে শুভাবহ।

অনেকে কেবল শব্দ শাস্ত্র পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন। তাঁহাদের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, মহাশয়! জৈনধর্ম্ম কিরূপ? তখন তাঁহারা আপন আপন পাণ্ডিত্য সংসারে বিস্তার করিবার আশয়ে, জৈনধর্ম্মের স্বরূপ না জানিয়া তাহার উত্তর দেন যে, জৈনেরা ঈশ্বর মানে না, আত্মাকে অনিত্য বলে এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকে মিথ্যা জ্ঞান করে। এইরূপ স্বেচ্ছাধীন উত্তর দিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসু মনুষ্যগণের কল্যাণেচ্ছা বিচলিত করিয়া দেন। তাঁহাদের উক্তরূপ কল্পিত বাক্যের প্রমাণ অদ্যাপি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়।

পাঠক মহাশয়! পক্ষপাতশূন্যভাবে যে পর্য্যন্ত জৈন-শাস্ত্র না দেখা যায়, তাবৎ ধর্ম্মকার্য্য বিড়ম্বনা মাত্র। যিনি রাগদ্বেষাদি অষ্টাদশ দূষণ রহিত, জ্ঞান, দর্শন, চারিত্রময়, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরঞ্জন, বীতরাগদেব, যিনি অর্হন্ অরিহন্তাদি শব্দের দ্বারা প্রকাশমান, তাঁহাকেই জৈনেরা ঈশ্বর স্বীকার করে। আত্মার সম্বন্ধে জৈনশাস্ত্রকারগণ যেরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন, কোন দর্শনশাস্ত্রেই সেরূপ দেখা যায় না। জৈনদিগের নিত্যানিত্যের স্বরূপ যদ্যপি নিরপেক্ষভাবে দেখা

যায়, তাহা হইলে একান্তপক্ষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ উহা অবশ্যই তিরস্কার দৃষ্টিতে দেখিবেন তাহার সংশয় নাই।

মূলরীতি অনুসারে আত্মা নিত্য পদার্থ, কিন্তু জন্ম মরণাদিরূপ নূতন ২ পর্য্যায়ান্তর ধারণ করে বলিয়া জৈনশাস্ত্রে আত্মাকে অনিত্য দর্শিত হইয়াছে। সাপেক্ষিত অভিপ্রায় না জানিয়া পণ্ডিতগণ তাহার বিপর্য্যয় করিতে সাহস করেন, সেরূপ করা তাঁহাদের নিতান্তই ভ্রম। হিংসাশ্রিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকেই জৈনগণ স্বীকার করে না; কেবল তাহাই নহে পরন্তু ঐরূপ শ্রাদ্ধকারীকেও তাহা করিতে নিষেধ করে। যথা—

"একস্থানচরোঽপি কোঽপি সুহৃদা দত্তেন জীবন্নপি
প্রীতিং যাতি ন পিণ্ডকেন, তদিদং প্রত্যক্ষমালোক্যতে।
জাতঃ ক্বাপ্যপজীবিতশ্চ কিল সো, বিভ্রন্নলক্ষ্যাং তনুং
মুগ্ধৈঃ শ্বেব স তর্পতে প্রিয়জনঃ পিণ্ডেন কোঽয়ং নয়ঃ?"॥

ভাবার্থ—মনুষ্য জীবিতাবস্থায় একত্র বাস করিয়া মিত্রের প্রদত্ত কল্পিত অন্নে কদাচ তৃপ্তিলাভ করে না। এ বিষয়ের প্রমাণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়, যেহেতু আহার স্বয়ং করিলেই তৃপ্তি হইয়া থাকে।

মাতা পিতা প্রভৃতি যে সকল প্রিয়জন মরণান্তে পরোক্ষ শরীর ধারণ করতঃ অন্যগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কুকুরের ন্যায় মূর্খ লোকে ভোজনের দ্বারা তাঁহাদের পরিতুষ্ট করিতে প্রয়াস পায়, ইহা কি যুক্তি সঙ্গত? আর এক কথা এই যে, মাংস বিনা শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, এইরূপ কল্পিত পরামর্শ দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মাংসের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, পরন্তু ঐরূপ শ্রাদ্ধ কার্য্যে কোন্ ধর্ম্মপ্রিয় মনুষ্য সম্মত হইবে?

কোন সময়ে পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে পুত্র একটী মহিষ খরিদ করে, সেই মহিষটীতে পিতার জীবাত্মা ছিল; পুত্র সেই মহিষকে সংহার করিয়া শ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া যখন স্বয়ং ভোজন করিবে, তখন একজন সুবিজ্ঞ মহাত্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। পরন্তু তিনি ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়াই প্রতিগমন করিতেছেন দেখিয়া শ্রাদ্ধকারী পুত্র পশ্চাৎ গমনপূর্ব্বক মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, হে পূজ্যপাদ! আপনি আমার গৃহ হইতে ভিক্ষা না লইয়া কি জন্য চলিয়া যাইতেছেন? তখন মুনি ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন, যেখানে মাংস ভোজন হয় মুনিগণের সে স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করা আচার বিরুদ্ধ। তোমার গৃহে আসিয়া আমার বৈরাগ্য বুদ্ধি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া পুত্র জিজ্ঞাসা করিল যে, আমার গৃহে আসিয়া আপনার বৈরাগ্য হইবার কারণ কি, তাহা কৃপা করিয়া বলুন। মুনি তদুত্তরে কহিলেন যে, যাহার শ্রাদ্ধ তুমি করিলে, তাঁহার জীবাত্মা ঐ মহিষে বিদ্যমান ছিল, তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ, এবং যে কুক্কুরী মাংসমিশ্রিত অস্থি ভক্ষণ করিতেছে সে তোমার মাতা, আর যাহাকে ক্রোড়ে করিয়া তুমি মাংস মিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইতেছ সে তোমার পরম শত্রু, এই সকল দেখিয়া আমার বৈরাগ্যবুদ্ধি জন্মিয়াছে। পুত্র তখন মুনিকে বলিল যে, আপনার এ সকল কথা সত্য কি না তাহা কেমন করিয়া জানিব? মুনি তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন যে কুক্কুরী যেখানে ভূমি খনন করিতেছে তথায় প্রোথিত অর্থ আছে তোমাকে দেখাইয়া দিবে। কুক্কুরের স্বভাব অনুসারে

কুকুরী সেই স্থান খনন করিতে করিতে অর্থ নির্গত হইল। তখন পুত্র বুঝিল যে শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে অনর্থ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ হিংসা করা হইয়াছে। শ্রাদ্ধ প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃলোকে প্রাপ্ত হন্ একথা মিথ্যা, কারণ জীব স্বকৃত কর্ম্মের ফল স্বয়ং ভোগ করে। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য স্বার্থান্ধ মনুষ্যগণ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রচলিত করিয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া শ্রাদ্ধাকারী সেইদিন হইতে শ্রাদ্ধ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। মাংসাহারের লোভপ্রযুক্ত অনেক ব্রাহ্মণনামধারী মনুষ্য একত্র মিলিত হইয়া বিচার পূর্ব্বক স্থির করিয়াছে যে শ্রাদ্ধের দিবস সাধুগণকে ভিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, এইরূপ প্রথা পূর্ব্ব-দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কূর্ম্মপুরাণে উল্লেখ আছে যে, শ্রাদ্ধদিনে অতিথি সাধু প্রভৃতিকে অগ্রে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ শ্রাদ্ধকর্ত্তা ভোজন করিবে, তাহা না করিলে তাহাকে ঘোর পাতকের ভাগী হইতে হয়। যথা—

"ভিক্ষুকো ব্রহ্মচারী বা ভোজনার্থমুপস্থিতঃ।
উপবিষ্টস্তু যঃ শ্রাদ্ধে কামং তমপি ভোজয়েৎ" ॥১॥
"অতিথির্যস্য নাশ্নাতি ন তৎ শ্রাদ্ধং প্রশস্যতে।
তস্মাৎ প্রযত্নাৎ শ্রাদ্ধেষু পূজ্যা হ্যতিথয়ো দ্বিজৈঃ ॥২॥
"আতিথ্যরহিতে শ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
কাকযোনিং ব্রজন্ত্যেতে দাতা চৈব ন সংশয়ঃ" ॥৩॥

কূর্ম্মপুরাণ ২২ অধ্যায়।

বর্ত্তমান সময়ে উপরোক্ত শাস্ত্রোল্লিখিত বচনের বিপরীত প্রবৃত্তিই দেখা যায়, সেইজন্য সাধুগণকে শ্রাদ্ধদিবসে ভিক্ষা না দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

এক্ষণে জৈনদিগের অন্তিম কথা এই যে, তাহারা ঈশ্বর ও আত্মা ইত্যাদিকে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে স্বীকার করে, পরন্তু শ্রাদ্ধকার্য্য স্বীকার করে না। কারণ অহিংসা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই ধর্ম্ম হিংসা হইতে কি প্রকারে হইবে? যে কমল জল হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা অগ্নি হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইবে? যে বিষ ভক্ষণ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য, জীবিতাশা করিয়া সেই বিষ ভক্ষণ করিলে কি জীবিত থাকা সম্ভব? সেইরূপ পাপের হেতুভূত "বধ" কি কথনমাত্রেই "অবধ" হইতে পারে?

সজ্জনগণ! আপন আপন হৃদয়ে মৈত্রীভাব ধারণ কর, ভ্রাতৃভাব শব্দকে অগ্রে করিয়া কতলোক মৈত্রীভাব ভুলিয়া গিয়াছে। মনুষ্যের সহিত প্রেমভাব রাখার নাম ভ্রাতৃভাব, এবং ক্ষুদ্রজীব হইতে ইন্দ্র পর্য্যন্ত সকলের সহিত প্রেমভাবের নাম মৈত্রীভাব। যখন তোমাদের সেইরূপ মৈত্রীভাবের স্মরণ হইবে, তখনই তোমরা মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিবে এবং মাংসাহার ত্যাগ করিলেই তোমরা পরমেশ্বরের প্রকৃত ভক্ত হইবে।

মাংসাহার নিষিদ্ধ বিষয়ে পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌-গণের অভিপ্রায়।

(১)

ইংরাজী-ভাষার প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষে (এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রীটানিকা) মাংসাহার পরিত্যাগ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার সারাংশ বর্ণিত হইতেছে।

"মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে নানা প্রকার লাভ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এস্থলে কেবল যে গুলি প্রসিদ্ধ তাহারই উল্লেখ হইতেছে, যথা—

(১) স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় লাভ—যে সকল লোক মাংসাহার করে, সম্ভবতঃ তাহারা যে পশুর মাংস ভক্ষণ করে, সেই পশুর শরীরে যত প্রকার রোগ থাকে তাহা তাহাদের শরীরে সংক্রামিত হয়, তদ্ভিন্ন যে সকল পশু নৈসর্গিক খাদ্য ঘাস ছাড়া অন্যান্য পদার্থ আহার করে, সেই সকল পশুমাংস যাহারা খায়, তাহারা বিকৃত বায়ু হইতে উৎপন্ন বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়।

(২) অর্থ-সম্বন্ধীয় লাভ—ফলাহার অপেক্ষা মাংসাহারে অধিক ব্যয় হয়। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিলে তিন চারিজন ফলাহারীর উদর পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ অর্থে একজন মাংসাহারীর উদর পরিপূর্ণ হয় না।

(৩) সামাজিক লাভ—এক একার জমীতে ধান্য, গম প্রভৃতি বপন করিলে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা যত লোকে খাইতে পারে, সেই পরিমাণ শস্য যদ্যপি আহারোপযোগী পশুগণকে খাওয়ান যায়, তবে সেই সকল পশুর মাংসে তত লোকের পেট ভরিবে না। যেমন, মনে করুন এক একার জমীতে শত মন ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতে একজন লোক সপরিবারে এক বৎসর স্বচ্ছন্দে আহার করিবে, কিন্তু যদি সে দশটী পশু পালন করে ও তাহাদের জন্য ঐ এক একার জমী ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হইবে, ঐ পশুগণ শীঘ্রই তাহা খাইয়া ফেলিবে এবং সেই সকল পশুমাংসে এক জনের এক বৎসরকাল সম্পূর্ণরূপে ভোজন নির্ব্বাহ হইবে না।

(৪) জাতীয়উন্নতি—সমস্ত সভ্যজাতির এইরূপ উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক যাহাতে সকলে অধিক পরিশ্রমী এবং কার্য্যক্ষম হয় এবং তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়; পরন্তু ঐরূপ হওয়া তখনই সম্ভব যখন লোকে অধিক পরিমাণে শাকান্নভোজী হইবে। যতই নিরামিষ ভোজীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে কৃষকগণ ততই পরিশ্রমের সহিত অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপে সেই জাতিতে ও সমাজে অধিক পরিশ্রমী লোক উৎপন্ন হইবে।

(৫) চরিত্র সম্বন্ধে উন্নতি—সে সকল মনুষ্যের প্রথম হইতেই সাহস, ধীরতা এবং নির্ভয়তা প্রভৃতি গুণ জন্মিয়াছে তাহাদের উচিত যে তাহাদের জ্ঞান ক্রমশঃ যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহারা মনুষ্যতা শিক্ষা করে এবং পীড়িত জীবদের সহিত সহানুভূতি করিবার অভ্যাস করে। নিরামিষ আহার করিলে মাংসাহার জন্য পশুদিগের উপর যে অত্যাচার করা হয় এবং তাহাদের যে পীড়া দেওয়া হয় তাহা দূর হইবে; তজ্জন্য মাংসাহারের প্রবৃত্তি অবরোধ করা সর্ব্বথা উচিত।

(২)

আহার, আরোগ্য, এবং বল।

লণ্ডনের কাউণ্টী কৌন্সিলের প্রয়োগ।

ইংরাজী সন ১৯০৮ সালে "লণ্ডন ভেজিটেরিয়ন্ এসোশিএসনের" সেক্রেটরি মিস্ এফ্, আই, নিকল্‌সন্ দশ সহস্র বালককে ছয় মাস কেবল বনস্পতি আহার দিয়া ছিলেন, এবং "লণ্ডন কাউন্‌টী কৌন্সিল" ততগুলি বালককে ছয় মাস মাংস আহার দিয়াছিল; পরে ঐ দুই বিভাগের বালকদের বল পরীক্ষার জন্য তথাকার বৈদ্যশাস্ত্র নিপুণ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন, অবশেষে তাঁহাদের ইহা স্থির হইল যে, "বনস্পতি আহার করিয়া যে সকল বালক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে তাহারাই সমধিক বলবান্, মেধাবী ও রূপবান্ হইয়াছে"। সেই প্রবন্ধে "লণ্ডন কাউণ্টীকৌন্সিলের" অনুরোধে "ভেজিটেরিয়ন্ এসোসি-

এসনের ” সভা হইতে সহস্র সহস্র দরিদ্র বালককে কেবল বনস্পতি আহার দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে।

(৩)

প্রো এচ্ শাফ্হোজেন মহাশয় বলেন যে মনুষ্য মূল প্রকৃতির অনুসারে মাংসাহারী নহে, কারণ পুচ্ছবিহীন বাঁদরের দন্তের সদৃশ মনুষ্যের দন্ত মেওয়া খাইবারই উপযুক্ত, মাংস খাইবার জন্য উহা উৎপন্ন হয় নাই।

(৪)

ডাঃ সিল্‌বেষ্টর গ্রেহেম বলেন যে—শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিজ্ঞান দ্বারা স্থির হইয়াছে যে মনুষ্যজাতি স্বাভাবিক প্রণালী অনুসারে কেবল অন্ন, ফল, বীজ মেওয়া এবং শস্য আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত প্রাণী।

(৫)

প্রমাণভুত ডাক্তারগণের ঘোষণা।

অনেকে সময়ে সময়ে এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, ভেজিটেরিয়ন্ অর্থাৎ অন্ন ফল ও বনস্পতি আহারের ব্যবস্থা কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ ডাক্তারের অভিপ্রেত? তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত সমালোচনা বিশেষ উপযোগী হইবে। এই সকল বিষয় প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের দ্বারা সমালোচিত হইয়া লণ্ডন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; ডাক্তারগণ স্বয়ং বনস্পতি আহার করিয়াছেন এবং রোগীদের ব্যবস্থা করিয়াছেন, পশ্চাৎ তাহার ফল পাইয়া সাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছেন যে "মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার ভেজিটেবল্, পরন্তু মাংস অথবা মৎস্য নহে"।

"আমরা নিম্নে স্বাক্ষরকারী ডাক্তারগণ ভেজিটেরিয়নিজম্ অর্থাৎ অন্ন, ফল, ও বনস্পতি আহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়াছি এবং উহার মূল সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া সাধারণের নিকট এইরূপ প্রচার করিতেছি যে, ভেজিটেবল্ আহারের উপকারিতা কেবল যে বিদ্যার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু উহা মনুষ্যগণের জীবনকে উত্তমদশা প্রাপ্ত করাইবার বিশেষ উপযোগী।

অন্ন, ফল এবং বনস্পতি আহার হইতে শরীর সবল রাখিবার উপযোগী উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহা কেবল যে রাসায়নিক ও পদার্থ বিজ্ঞান শাস্ত্রের

প্রয়োগানুসারে স্থির হইয়াছে এমত নহে, পরন্তু অনেকে নিয়মিত রূপে বনস্পতি আহার পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া নিজের শারীরিক উন্নত অবস্থার উদাহরণ হইতে ইহা স্থির করিয়াছেন যে, বনস্পতি হইতে যে সকল উপাদান পাওয়া যায়, তাহা মাংসের উপাদান অপেক্ষা অতি শীঘ্র জীর্ণ হয়।

বিদ্বদ্দৃষ্টির সহিত দেখিলে আমাদিগকে ভেজিটরিয়নিজম্ (নিরামিষ্যাহার) কেই সম্পূর্ণ ও সন্তোষ কারক-রূঢ়ি বলিতে হইবে; তদুপরন্ত, আমিষ ভোজনে পশ্বাদির প্রতি যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করা হয় এবং তাহাদিগকে যে সকল কষ্টের অধীন করা হয় উহার সহিত নিরামিষ ভোজনে প্রযুক্ত অন্ন, ফল, ও অন্যান্য বনস্পতির স্বচ্ছতার তুলনা করিলে আমাদিগকে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে আমিষ ভোজন ত্যাগে আমাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। পক্ষান্তরে সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ভেজিটেরিয়নিজমের স্থান অত্যন্ত উচ্চ।

প্রাগুক্ত সূচনায় নিম্নলিখিত তের জন লোকের স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

১ রবর্ট বেল এম, ডী,
২ জর্জ ব্লেক এম. বী, (এডিন্,)
৩ এ, জে, এচ, কেম্পী এম, আর, সী এস্,
৪ এচ্. এচ্. এস্ ডোর্মন্. এম্ ডী.
৫ অগষ্টুস্ জনষ্টন্ এম্. বী:আর্, সী, এস;
৬ এচ্ব্যালেন্ টাইন্ নেগ্স,, এম্, আর সী এস ; এল, আর, পী,
৭ অল্বর্ট গ্রেস্‌বেল্ এম্ এ ; এম ডী,
৮ রবর্ট এচ্. পর্কস্ এম্ ডী ; এফ্, আর, সী এম্,
৯ বাল্টর্ আর্ হেড়বেন্ এম্ ডী: এল্ আর, সী, পী; এম, আর্ সী, এস্,
১০ জে, ষ্টেন্‌সন্ হুকর এম্, ডী
১১ অল্‌ফ্রেড বোসেন এম্. ডী,
১২ জন্ রীড্ এম. বী ; সী. এম্,
১৩ জর্জ বী বাল্টর্স এম্, ডী,

(৬)

প্রামাণিক রসায়ন-শাস্ত্রবেত্তাদিগের ঘোষণা।

প্রাগুক্ত ঘোষণার উপরান্তে সেই সকল সাএন্‌টিষ্ট (বৈজ্ঞানিক) দিগের ও ঘোষণা আছে যাঁহারা ইহা প্রচার করিতে চাহেন যে অন্ন, ফল, ও

অন্যান্য বনস্পতি সমূহই মনুষ্যের খাদ্য, যেহেতুক ঐ সকল খাদ্যই মনুষ্যের পক্ষে বলদায়ক ও স্বাস্থ্যকর। যেরূপে তাঁহারা এ বিষয় সূচিত করিয়া থাকেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"প্রজাবর্গের শারীরিক হানির কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশে "ইণ্টর ডিপার্টমেণ্টল কমিটী" নিয়োজিত করা হইয়াছিল। এই কমিটী আপন রিপোর্টে যে মত প্রকাশ করে উহা আমাদিগেরও অনুমোদিত। কমিটীর মতে—

অসংরীত্যানুসারে গৃহিত ও সপূর্ণতাবিশিষ্ট অগৃহিত ভোজনই শরীর বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভূরি কারণের মধ্যে এক প্রধান কারণ, এবং এই রীতিই সুরাপানে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে।

পুনশ্চ এই রিপোর্টের দ্বারা জানা যায় যে আহার সামগ্রী যথাযথ প্রস্তুত করণেও লোকে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে; যে খাদ্য অল্প ব্যয় সাধ্য অথচ সম্পূর্ণরূপে শরীরের পুষ্টিসাধক, তদ্বিষয় সাধারণে বুঝিতে পারিলে তাহাদের দুঃখের অত্যন্ত লাঘব হইতে পারে, এই জন্য লণ্ডন নগরের লর্ডমেয়র ও অন্যান্য নগরের মেয়র প্রভৃতি এতদ্বিষয়ক তত্ব প্রচারের জন্য সূচনা দিয়া থাকেন।

ইহাতে খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে মাংসরুচির বিষয় বিশেষ উল্লেখ না করিয়া যাহাতে গমের আটা, যব চাউল (তণ্ডুল মাকোই, মটর, ডাল, শুষ্ক মেওয়া অর্থাৎ বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি, এবং সুপক্ক ও সুমিষ্ট ফল, নবজাত বনস্পতি প্রভৃতি ভেজিটেবল খাদ্যের উপযোগিতার বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞান হয় ও যাহাতে যথার্থ পুষ্টিকর খাদ্যের তত্ব সাধারণে বুঝিতে পারে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হউক ইহাই বলা হইতেছে, যে হেতুক অন্ন, ফল, বনস্পতি প্রভৃতি খাদ্যের উপযোগিতা বুঝিতে পারিলে সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বাস্থ্য উন্নত হইতে পারে।

এই সূচনাতে প্রসিদ্ধ নামের অতিরিক্ত অন্যান্য লোকেরও স্বাক্ষর আছে।

সর্, জেমস্ কি্রচটন ব্রাউন্ এফ্, আর্, এস্,

সর্ বিলিয়ম্ ক্রুক্স ফস্, আর্, এস্

সর্ লোডর ব্রণ্টন্ এফ্ আর্, এস,

ডা, রবর্ট হচীসন্

ডা, জন্ বর্ডে এফ, আর, এস্,

ডা, রবর্ট মিলর

মি. এডবর্ড বেডর্ড

ডা, ডবল্যু, আর স্মিথ,

মি, এ, ডী, ক্রীপ কে, সী, বী, ও. সী, বী,

মি, ডবল্যু বী. তেগেটমীয়র এফ, এল, এস,

মি, এ. পিয়র্স গোলস্‌ড

ডা. সিমস্ উড্‌হেড্

মি-জার্জ্জ হেণ্ড সলো

সর্ মুঅল বিল্‌কস বেরোনেট্ এফ আর, এস্-

(৭)

ব্যারন্ কুভিএ মহাশয় বলেন মনুষ্যশরীরের প্রত্যেক অংশ সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষিত হইলে উহার গঠন প্রণালী ইহাই প্রমাণ করে যে মনুষ্য কেবল মাত্র অন্ন, ফলও শাক ভোজনেরই যোগ্যতা রাখে। ইহা সত্য যে মাংস ভোজন ত্যাগ করায় মনুষ্যদিগকে কঠিন প্রতিবন্ধকতা ভোগ করিতে হয় এবং অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প না হইলে এইরূপ প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করা অত্যন্তই কঠিন হইয়া পড়ে, পরন্তু ইহাতে তাহাদের মাংস ভোজনের পক্ষ সমর্থিত হয় না। কোন এক জল যাত্রায় নাবিকেরা এক মেষকে কিছুকাল যাবৎ মাংস খাওয়াইয়া রাখে কিন্তু যাত্রা শেষ হইলে ঐ মেষ আপন স্বাভাবিক খাদ্য শাকাদি গ্রহণের স্পৃহা প্রকাশ করে। এইরূপে ঘোটক কুক্কুর এবং কপোতক প্রভৃতিরও উদাহরণ পাওয়া যায় যাহারা বহুকাল যাবৎ মাংসাহার করিয়াও অবশেষে আপন নৈসর্গিক খাদ্যে রুচি ও মাংসে অরুচি প্রকাশ করিয়াছে।

(৮)

প্রো—লিনিয়স্ বলেন যে মেবা, ফল; ও শস্যাদির ভোজন মনুষ্যের পক্ষে সবিশেষ যোগ্যতা বিশিষ্ট, এ বিষয় প্রত্যাসত্তির (এনালোজীর) নিয়মানুসারে মনুষ্যের মুখ, মাড়ী; হস্ত ইত্যাদির গঠনের সহিত চতুষ্পদ জন্তু, বনমানুষ ও বানরের সেই সকল অঙ্গের গঠনের তুলনা করিলে স্পষ্ট সিদ্ধ হইবে।

(৯)

প্রো—সর্ রীচর্ড ওএন বলেন বানরের দন্ত-গঠনের সহিত মনুষ্য দন্ত-গঠনের যেরূপ সাদৃশ্য সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। আর মনুষ্যদন্ত ও বানর দন্তের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহাই প্রমাণ করে যে মনুষ্য

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই উদ্যানবৃক্ষের ফল ভোজনের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, যে হেতুক ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে বানরেরা ফল, শস্য, ফলের বীজ, ও অন্যান্য বনস্পতি বর্গ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকারক রসবিশিষ্ট ও স্বাদু, আপন নিয়ত আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে।

(১০)

প্রো—পীয়র গেসেণ্ডী—যিনি খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞানী স্বরূপ আপন নামাঙ্কিত করিয়া ছিলেন তিনি বলেন " আমি এ স্থলে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক গঠনানুসারে আমাদিগের দন্ত-গঠন ইহাই প্রমাণ করে যে আমরা মাংসাহারের জন্য নিরূপিত নহি বরং মেবা বা ফল মাত্র আহারের জন্য উৎপন্ন হইয়াছি।

(১১)

জগৎ বিখ্যাত বিদ্বৎ কুলচূড়ামণি চার্ল্স ডারবিন স্পষ্ট বলেন যে সেই অপরিজ্ঞাত কাল ও স্থান যখন ও যথায় মনুষ্য আপন শক্তির আবরণ প্রথম নষ্ট করে তখন বোধ হয় সে উষর-প্রধান-দেশ নিবাসী ছিল ; ডারবিনের এই সিদ্ধান্ত মনুষ্যের প্রাথমিক ফলোপভোগিতা ও ভোজনার্থে প্রাতিদ্বন্দ্বিক ফলান্বেষিতার প্রতিপাদক।

(১২)

প্রো—সর্ চার্লস বেল এফ্. আর্, এস্, মহাশয় বলেন যে আমার অনুমানে এ বিষয়ে কোন আশ্চর্য্য নাই যে মনুষ্য গঠন সম্বন্ধে প্রত্যেক বৃত্তান্তই ইহা প্রমাণ করিবে যে সে ফলাহারী প্রাণীর ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত মুখ্যরূপে উহার দন্ত, পচনকারী অঙ্গ-সমূহ ও চর্ম্মের গঠন এবং অবয়বের রচনার উপর উপন্যস্ত।